লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির সায়েন্স ফ্যান্টাসি

মহাপ্লাবন

সম্পাদনা : অদ্রীশ বর্ধন

লিওনার্দো দ্য ভিন্সির সায়েন্স ফ্যান্টাসি

ম হা প্লা ব ন

সম্পাদনা ঃ অদ্রীশ বর্ধন

গৌরচন্দ্রিকা

আজ থেকে ছাব্বিশ বছর আগে ফ্রীস্কুল স্ট্রিটের পুরোনো বইয়ের দোকানে দাঁড়িয়ে চাতক পাখির মতন বই খুঁজছিলাম। একটা চটি পকেট বই নজরে পড়ল, চমকে উঠলাম, লিওনার্দো দ্য ভিন্সি সায়ান্স-ফ্যানট্যাসি লিখেছেন, জানা ছিল না। ইংরেজি পকেট বুক। বেরিয়েছি আমেরিকা থেকে। মলাটের ছবি লিওনার্দো আঁকেননি বটে। কিন্তু বেশ আকর্ষণীয়। দুটি মেয়েকে নিয়ে পাহাড় বেয়ে ওপরে উঠছে এক পুরুষ। মেয়ে দুটি ক্ষতবিক্ষত শরীরে এলিয়ে পড়ছে। পাহাড়ের নিচে লাল সমুদ্র বিশাল ঢেউ তুলে শহরের ওপর লাফিয়ে পড়েছে।

সায়ান্স-ফ্যানট্যাসি নভেল। নাম, দ্য ডিলিউজ। লেখক, লিওনার্দো দ্য ভিন্সি। সম্পাদক, রবার্ট পেইন।

বইটা কিনলাম। মাত্র এক টাকায়।

আগে পড়লাম সম্পাদকের কথা—যা তিনি সবিনয়ে লিখেছেন উপন্যাস-এর শেষে— গোড়ায় নয়। দশ পৃষ্ঠার সেই সম্পাদকীয়র মূল কথা, লিওনার্দো দ্য ভিন্সি খুচখাচ অনেক পয়েন্ট, স্কেচ লিখে আর এঁকে রেখেছিলেন —বই আকারে আর বের করা হয়নি। এই সব কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া গেছিল একটা ছোট উপন্যাস—যে উপন্যাসে তিনি পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কাহিনী লিখেছেন।

কিন্তু সম্পূর্ণ উপন্যাস নয়। শুরু করেছেন, পরিচ্ছেদ শিরোনামগুলো লিখে রেখেছেন, মাঝে মাঝে এক-একটা দৃশ্যের বর্ণনা খুঁটিয়ে লিখে ফেলে রেখেছেন—সব মিলিয়ে যেহেতু শুধু ভেবেছেন, খাপছাড়াভাবে লিখেছেন—তাই উপন্যাসের ধর্ম রক্ষা করেননি। ওঁর মতন জিনিয়াস নিশ্চয় দিনের পর দিন ভেবে যে মহা-উপন্যাস লিখতেন —তা পরবর্তীকালে সায়ান্স-ফিকশনের পুরোধা হিসেবেই স্বীকৃতি পেত। কোন্ ব্যাপারটায় তিনি অগ্রণী নন ? বাতাসের চেয়ে ভারি মেশিনে চেপে বাতাসকেই কাজে লাগিয়ে গগনবিহারী হয়েছিল মানুষ যেদিন, তার চারশ বছর আগেই তো এরোডায়নামিক্স-এর বেশির ভাগ নিয়ম উনি আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন, ওঁর সায়েন্স-নোটবুক সম্প্রতি খুঁজে পাওয়া গেছে। তাতে উনি বাদুরের মতন ডানা মেলে আকাশে টহল দেওয়ার জন্যে একটা অদ্ভুতদর্শন পুষ্পকরথের কথা খুঁটিয়ে লিখেছিলেন—যন্ত্রটার ছবি পর্যন্ত এঁকে রেখেছিলেন। আমরা সেই যন্ত্রকে অনায়াসেই বলতে পারি হেলিকপ্টার'এর পূর্বপুরুষ 'অরনিথপটার'—অর্থাৎ, এমন একটা ফ্লাইং মেশিন যা ডানা ঝাপটে পাখির মতন উড়বে। গ্লাইডার-এর সাবেকি নকশাও উনি এঁকে রেখেছিলেন যা কিনা বাতাসের ওপর দিয়ে পিছলে চলে যাবে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায়।

লিওনার্দোর একটা মহৎ দোষ বা মহৎ গুণ ছিল। উনি ওঁর সৃষ্টি নিয়ে যত্তো এক্সপেরিমেন্ট করেছেন, তার সবই গোপনে করেছেন। কাজেই, কেউই জানে না, সত্যিই তিনি এইসব আজব যন্ত্র বানিয়ে আকাশে উড়ে বেড়িয়েছিলেন কিনা। জিনিয়াসরা এমনই হয়। সিক্রেট রাখেন নিজেদের কীর্তিকলাপ। থেকে যান সাধারণের নাগালের বাইরে।

সিক্রেসি-র কথা বলতে গিয়ে তাঁর একটা অদ্ভুত খেয়ালের কথা এখানে না লিখলেই নয়। তাঁর বিখ্যাত 'নোট্স্'—যা কিনা তাঁর সংক্ষিপ্ত মন্তব্য অথবা সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা অথবা সংক্ষিপ্ত টীকা—এ সবই লিখেছেন সাংকেতিকভাবে। হঠাৎ দেখলে মনে হবে, আগডুম বাগডুম এ সব কী লিখেছেন লিওনার্দো ? কিন্তু সেইসব লেখা আয়নার সামনে ধরলে প্রতিবিম্ব ফুটিয়ে তুলবে আসলে কি লিখেছেন। ভাবনাচিন্তা যেহেতু মৌলিক এবং সাধারণ মানুষের কাছে তা নিছক পাগলামি—তাই কত সহজে সেই সব লেখা দুর্বোধ্য আর গুপ্ত রেখে দিয়েছিলেন 'লাস্ট সাপার' আর 'মোনালিসা'র অমর চিত্রশিল্পী। এই খ্যাপামির মূলে হয়তো ছিল তাঁর বাঁহাতে লেখবার অভ্যেস—অথবা, হয়তো নিজেকে লুকিয়ে রাখতেই চেয়েছিলেন—নিজেকে, মানে, নিজের উদ্ভট ভাবনাচিন্তাকে।

কিন্তু তা করেননি আজকের সায়ান্স-ফিকশন লেখকরা। উদ্ভট আইডিয়ার ছড়াছড়ি ঘটিয়ে তাঁরা বেশকিছু সবজান্তার কাছে বিশ্বজোড়া হাসির খোরাক কুড়িয়ে যাচ্ছেন। তাতে অবশ্য তাঁরা দমে যাচ্ছেন না। এস-এফ লেখক ফ্রেডারিক ফোল তাই একটি সংকলন-গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছিলেন—"সায়ান্স-ফিকশন লেখকরা বড্ড অবাধ্য, দুর্দান্ত, একগুঁয়ে, জেদী। জাতছাড়া লেখক। তামাম দুনিয়ায় এমন একগুঁয়ে মানুষ আর নেই। তাঁরা যা বিশ্বাস করেন, নিজেরা বিশ্বাসযোগ্য বলেই বিশ্বাস করেন —এই নয় যে আইডিয়াগুলো অন্যেরা তাঁদের মাথায় ঢুকিয়ে দিয়ে যান।"

ঘুরিয়ে বলেছেন, এস-এফ লেখকরা প্রত্যেকেই এক-একজন জিনিয়াস। যা সত্যি হবে বলে মনে করেন, তাই লেখেন।

1452 খ্রিস্টাব্দে ধরায় আগমন করে মাত্র 67 বছর বেঁচে থাকেন লিওনার্দো। সম্পূর্ণ আত্মপ্রকাশ না করেও দেখিয়ে দিয়ে গেছেন, তিনি কিং অফ জিনিয়াস ছিলেন। পাখিদের খাঁচা থেকে উড়িয়ে দিতেন—লোকে ভাবত, আচ্ছা পাগল তো ! আসলে দেখতেন, পাখিরা কিভাবে উড়ছে ; পর্যবেক্ষণ করতেন আর ভাবতেন, এইভাবে মেশিন বানালে শূন্যে ওড়া যাবে না কেন ? ছেলেবেলা থেকে কীটপতঙ্গ খুঁজেপেতে আনতেন আর তাদের প্রায়-জীবন্ত ছবি আঁকতেন—মূলে রয়েছে সেই সাধনা—প্রকৃতির রহস্য আয়ত্ত করার গবেষণা। পোকামাকড় থেকে শুরু করে মহাশূন্যের নক্ষত্রদের নড়াচড়া নিয়েও ভেবেছেন। ফলে, সংঘাত লেগেছিল জ্যোতিষীদের সঙ্গে, ছল-রসায়নবিদদের সঙ্গে—

তৎকালে যাঁদের বলা হতো অ্যালকেমিস্ট—যাঁরা সস্তার ধাতু থেকে সোনা বানিয়ে রাতারাতি কুবের হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন, যাঁরা কুসংস্কার আর বিবিধ আতঙ্কে থাকতেন। ভয়ডরহীন লিওনার্দোকে হামেশা বিধর্মীও বলা হয়েছে—কিন্তু উনি টলে যাননি—বলতে ছাড়েননি যে, গির্জের বহু ধ্যানধারণা তো বৈজ্ঞানিক প্রগতির পরিপন্থী!

অটোমোবাইল গাড়ি এখন পথে-ঘাটে গীয়ার বদল করে ধেয়ে চলেছে—ঝপাঝপ করে ফার্স্ট গীয়ার, সেকেন্ড গীয়ার, থার্ড গীয়ার যারা দিচ্ছে, তাদের অনেকেই জানেনা, গীয়ার যন্ত্রটা আসলে খাঁজকাটা তিনরকমের ব্যাস-এর তিনটে চাকা লাগানো থাকে একটা রডে। খু-উ-ব সহজ ব্যাপার। সব মোটর মেক্যানিক তা জানে। কিন্তু কেউই জানে না, গীয়ারের এই আইডিয়াটা প্রথম মাথায় এনেছিলেন একজন ছবি-আঁকিয়ে, যন্ত্রবিশারদ বৈজ্ঞানিক—যিনি কিনা জন্মেছিলেন চাষার ঘরে, লেখাপড়া শেখেননি—কিন্তু তা পুষিয়ে নিয়েছেন নিজে রাশি রাশি বিজ্ঞানের কেতাব পড়ে আর জ্ঞানীগুণীদের কাছে থেকে।

পাখি সাঁই সাঁই করে উড়ে যাচ্ছে আকাশে. আমরা তা চিন্তাশূন্য মনে দেখি আর অন্য কাজ করি—খুবজোর একটা কবিতা লিখে ফেলি। ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ছে বাতাসে আপন ভঙ্গিমায়—তার মধ্যে দেখবার কিছু আছে কী ? অথবা, বাতাসের গতিপ্রকৃতি ? জলের আনাগোনা ? মাছের সাঁতরানো ? সাধারণ মানুষের কাছে এই সব রোজকার ব্যাপার নিয়ে মাথাঘামানো স্রেফ সময়ের অপচয়।

কিন্তু লিওনার্দোর কাছে নয়। তাই তিনি আকাশের পাখির ওড়া আর সমুদ্রের মাছের সাঁতরানোর মধ্যে মিল খুঁজে পেয়েছিলেন—বাতাসের বয়ে যাওয়া আর জলের বয়ে যাওয়ার মধ্যেও সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছিলেন। 'অ্যাকশন অ্যাণ্ড রিঅ্যাকশন'-এর মধ্যে মূলনীতির সংজ্ঞা নির্ণয় করেছিলেন—যার প্রয়োগ ঘটেছে বায়ুগতিবিদ্যায়—নিউটন তাঁর 'থার্ড ল অফ মোশন' আবিষ্কার করার দু'শ বছর আগে।

অথচ তিনি তাবৎ গুণীজনের কাছে স্বীকৃতি পাননি। চিত্রশিল্পী অথবা বৈজ্ঞানিক আর সামরিক আবিষ্কারের জন্যে কল্কে পাননি। তাই ফ্লোরেন্স ছেড়ে মনের দুঃখে চলে গেছিলেন মিলান শহরে। সেখানেও অযোগ্য ব্যক্তিকে মিলিটারি ইঞ্জিনীয়ার করা হয়েছে—তাঁকে নয়। ছবি এঁকে পেট চালাতে হয়েছে ভদ্রলোককে। মিলান শহরকে ঢেলে গড়বার আশ্চর্য পরিকল্পনাকে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি নাকি অসম্ভবের স্বপ্ন দেখতে ভালবাসেন!

অসম্ভবের স্বপ্ন !

হ্যাঁ, আবার দেখেছেন লিওনার্দো। তাঁর জন্মই যে অসম্ভবকে সম্ভব করার জন্যে। তাই নতুন ধরনের কপিকল বানিয়ে একটা পঁচিশ ফুট উঁচু কাদামাটির মূর্তিকে স্মৃতিসৌধের ওপর উঠিয়ে দিয়েছেন—আর এই করতে গিয়েই আধুনিক মোটর গাড়িতে যে জ্যাক ব্যবহার করা হয়—তাই বানিয়ে ফেলেছেন।

শুধু তুলি আর রঙ নিয়েই নিজেকে সীমিত রাখতে তিনি পারেননি। কী আশ্চর্য প্রতিভা ! ডাঙায়, সমুদ্রে, এমনকি সমুদ্রের নিচেও সামরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার আবিষ্কার করে গেছেন। ডুবুরির পোশাক আবিষ্কার করেছেন— সেইসঙ্গে আবিষ্কার করেছেন জলতলস্থ বাতাসের খুপরি ! শত্রু জাহাজের খোল যাতে ফুটো করে দেওয়া যায় !

একজন চিত্রশিল্পীর পক্ষে এই ধরনের আবিষ্কার কতখানি অবিশ্বাস্য আর বিস্ময়কর। অথচ প্রচারবিমুখ লিওনার্দো তাঁর এইসব আবিষ্কারের খুঁটিনাটি লিখে বই ছাপতে চাননি। কেন চাননি ? কারণ, মানুষের অশুভ প্রকৃতিকে উনি ভয়ের চোখে দেখতে শুরু করেছিলেন। বলেছিলেন— "সমুদ্রের তলায় গিয়ে গুপ্তহত্যার প্র্যাকটিস চালাবে যে !"

শেষ পর্যন্ত ইচ্ছে হয়েছিল লিওনার্দো-র, তাঁর সব লেখা বই আকারে প্রকাশ করে যাবেন। তখন তিনি সম্মান, অর্থ, নিরাপত্তা পেয়েছেন। কিন্তু সময় আর পেলেন না। আয়ু ফুরিয়ে গেল।

দুঃখের বিষয়, বিশ শতকের আগে তাঁর জীবনী রচয়িতারা তাঁকে যথোচিত সম্মান দেওয়া দূরে থাক—তাঁর স্বপ্ন, ধ্যান ধারণা, আবিষ্কারগুলোকে খেয়ালখুশির কল্পনা বলে পরিহাস করে গেছেন। এখন আমরা জেনেছি, বিজ্ঞানের দুনিয়ায় চিরকাল অমর হয়ে থাকবেন লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি—আধুনিক চিন্তাবিদ্‌দের মধ্যে তিনিই প্রথম মানুষ যিনি প্রকৃতির বহু সমস্যার সমাধান করার জন্যে পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন—এক কথায়, প্রকৃতির রহস্যভেদ করে প্রকৃতির কাছ থেকেই শিখতে চেয়েছেন। গ্যালিলিও, ফ্রান্সিস বেকন, ওয়াট আর নিউটন পরে যা আবিষ্কার করেছেন, সে সবের অনেক কিছুই লিওনার্দো আগেই জেনে ফেলেছিলেন—শুধু ওঁর পরিভাষা ছিল পরবর্তী বৈজ্ঞানিকদের পরিভাষা থেকে পৃথক।

এত কথা লিখলাম এই কারণে যে, সারাজীবন ধরেই যে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়েছিলেন লিওনার্দো—শুধু এই কথাটা বোঝাতে। তাই বুঝি তিনি চেয়েছিলেন সায়ান্স-ফ্যানট্যাসি লিখে দেখিয়ে দেবেন—মানুষের আত্মঘাতী যন্ত্র-আবিষ্কারই শেষ পর্যন্ত পৃথিবী ধ্বংসের মূল কারণ হয়ে দাঁড়াবে। বাইবেলের মহাপ্লাবনের মতন আর একটা মহাপ্লাবন শেষ করে দেবে এই পৃথিবীকে।

মনের মধ্যে নিশ্চয় অনেক ক্ষোভ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে উপন্যাসের উপকরণ বিক্ষিপ্তভাবে লিখে রাখতেন—সঙ্গতি ছিল না একটার সঙ্গে আর একটার। নিজেও বোধ হয় জানতেন না, সঠিক কোন পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে চান প্রথম আর শেষ এই উপন্যাসকে। উপন্যাসের অনেকগুলো অত্যন্ত নাটকীয় অংশ লিখে রেখেছিলেন ঠিকই—কিন্তু সেসবের মধ্যেও ছিল অস্পষ্টতা, দ্বিধা আর ব্যবধান। মাঝে-মধ্যেই অবশ্য উপহার দিয়ে গেছেন তাঁর অননুকরণীয় ম্যাজেস্টিক চিত্রমালা।

লিওনার্দোর জীবন আজও সুস্পষ্ট নয় এই শতকের মানুষের কাছে। তাই বলা যাবে না কেন তিনি নতুন এক মহাপ্লাবনের গল্প লিখতে প্রয়াসী হয়েছিলেন—সেই কাহিনীতে থাকবে আকাশ থেকে অনল ধারা নেমে আসার লোমহর্ষক দৃশ্য-কল্পনা। এমনও হতে পারে যে, এই পৃথিবীর প্রতি প্রবল ঘৃণার উন্মেষ ঘটেছিল তাঁর অসাধারণ মেধা-সম্পৃক্ত মনের গহনে। তাই দুর্বল এক মুহূর্তে....অথবা, বারে বারে ফিরে আসা বহু দুর্বল মুহূর্তে, কল্পকাহিনীর মাধ্যমে পৃথিবীকে ধ্বংস করে ফেলতে চেয়েছিলেন; অথবা, বহু যন্ত্রের স্রষ্টা হিসেবে নিজেই হয়তো উপলব্ধি

করেছিলেন—এইসব যন্ত্রের বিপুল শক্তি বিপুলা এই ধরিত্রীকে কোন্ মর্মান্তিক পরিণতির দিকে নিয়ে চলেছে। সংক্ষিপ্ত টীকা, মন্তব্য, ব্যাখ্যাগুলো পড়তে পড়তে মনে হয়েছে, যাঁর লেখনী বিক্ষিপ্তভাবে টুকটাক করে মনের কথা লিখে গেছে—সেই মানুষটার মনের অপরাধবোধ তাঁর অজান্তেই ফুটে উঠেছে ছত্রে ছত্রে—বিশেষ করে যখন তিনি নিখুঁত বর্ণনা দিচ্ছেন বিধ্বংসী মহাপ্লাবন ডুবিয়ে দিচ্ছে শহর, মারছে মানুষ। যে অপরাধের ক্ষমা নেই—সেই অপরাধবোধ লেখার মুহূর্তে তাড়না সৃষ্টি করে গেছে তাঁর অন্তরের কন্দরে। কল্পনা করেছেন, বন্যার দরজা যখন খুলে গেছে, তখন সেই অন্তিম মুহূর্তে উপস্থিত রয়েছেন তিনি নিজেই। তাই উনি দেখাতে পেরেছেন, আকাশ থেকে নেমে এসে আগুন হানছে লেলিহান আঘাতের পর আঘাত, বিস্ফোরিত হচ্ছে পাহাড়ের পর পাহাড়, শহরের পর শহর, ফেটে চৌচির হয়েছে পর্বতশিখর, খড়কুটোর মতন শূন্যে ছিটকে যাচ্ছে মানুষ। ধোঁয়া আর অগ্নিশিখার করাল খপ্পরে বিলীন হয়ে যাচ্ছে সব কিছু। নার্ভাস পেন্সিল এমন একটা জায়গায় এসেছে যার পর আর কিছুই নেই—সব শেষ। প্রলয়ের পর কল্পনার আর কিছু থাকে কী ? সব যখন শেষ, যখন আর কিছুই থাকছে না, তখন প্যারাগ্রাফের পর প্যারাগ্রাফ লিখে গেছেন ঠাসবুনন পরিচ্ছন্ন অতিশয় আত্ম-সচেতন স্টাইলে যা মনে করিয়ে দেয় বিখ্যাত রোমীয় কবি ভার্জিল-এর ছন্দ—যিনি নিজেও পৃথিবীর অন্তিম মুহূর্তের কল্পনায় আবিষ্ট হয়ে থাকতেন, লিওনার্দোর এই 'মুড' সঙ্গীতকার বীঠোফেন-এর 'মুড'-এর সঙ্গে তুলনীয়, অথবা, তুলনীয় সেক্সপিয়রের 'মুড'-এর সঙ্গে—শেষ চারটে বিয়োগান্তক নাটক লেখার সময়ে এহেন 'মুড'-য়েই ছিলেন তিনি। চূড়ান্ত বিভীষিকায় নিপীড়িত হয়ে লিওনার্দো তাঁর লেখার মধ্যে ইঙ্গিত দিতে চেয়েছেন—চূড়ান্ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা তো রয়েছে শেষের ভয়ঙ্কর সেই দিনের মধ্যেই।

উনি এই উপন্যাসের বারোটা অধ্যায়ের নাম কি কি হবে, তা লিখে রেখেছিলেন। তার পরের অধ্যায়গুলোর আছে পুণরাবৃত্তি আর কাহিনী-বিস্তার। প্রথমে একজন ভবিষ্যৎ বক্তার প্রসঙ্গ এনেছেন—তারপরে কোত্থাও বলেন নি, কে সেই ভবিষ্যৎ বক্তা। এক জায়গায় মার্জিনে লিখেছেন, 'লিওনার্দো দ্য ভিন্সির ভবিষ্যৎবাণী'। কিন্তু সেই ভবিষ্যৎবাণীগুলো যে তাঁর নিজস্ব, তা বোঝবার উপায় নেই। কথাগুলো আর এক পন্ডিতের হতে পারে—নাম তাঁর সাভোনারোলা—1494 খ্রিস্টাব্দে যিনি প্রলয় প্লাবনকালে নোয়া-র বিশাল নৌকো সম্পর্কে ভাষণ দিয়েছিলেন।

সব শেষ হয়েও যে শেষ হয় না—এই ধরনের কথাবার্তা ওই সময়ে অনেক পন্ডিত বলতেন। প্রলয়ের গ্রাসে পৃথিবী—এই ভাবনা যেন লিওনার্দোকেও সারা জীবন তাড়িয়ে নিয়ে গেছে। নোটবুকে ছাড়াছাড়াভাবে অনেক কথার একটা খণ্ড তুলে ধরেছেন তাঁর মনের এই নাছোড়বান্দা ভীতি। সেই লেখার তর্জমা নিচে দিলাম ঃ

এমন একটা সময়ে আসবে যখন শস্য-শ্যামলা সুজলা সুফলা এই পৃথিবী শুকনো খটখটে হয়ে যাবে—অনুর্বর হয়ে যাবে। পৃথিবীর জঠর থেকে যেভাবে জল নিষ্কাশন চলছে, তার কুফল একদিন ফলবেই। প্রাকৃতিক নিয়মে পৃথিবী এগিয়ে যাবে অনিবার্য

পরিণতির দিকে। বরফ-শৈত্য আর বিরল-বাতাসের পর্ব সমাপনান্তে আগুনের মধ্যে দিয়ে চক্রের সমাপ্তি ঘটবে। পৃথিবী-পৃষ্ঠ কাঠ-কয়লার আকৃতি নেবে, প্রাকৃতিক সম্পদও আর থাকবে না পৃথিবী-পৃষ্ঠে।

ধাপে ধাপে চরম এই পরিণতির দিকেই এগিয়েছেন লিওনার্দো, ধ্বংস-শিল্পের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা তিনি—মানব-হৃদয়ের অতলে বিজ্ঞান-সড়ক কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে, মনশ্চক্ষে তিনি তা প্রত্যক্ষ করেছেন।

রবার্ট পেইন তাঁর নোট্‌স্ অবলম্বনে লিখেছেন 'দ্য ডিলিউজ'। ছাড়াছাড়া বক্তব্যকে নিজের কথা দিয়ে জুড়েছেন। বারোটা পরিচ্ছেদের মধ্যে চারটে পরিচ্ছেদ গ্রহণ করেছেন।

সেই কাহিনীকেই এযুগের পাঠকপাঠিকার মনের উপযুক্ত খোরাক করে তোলবার চেষ্টা করব আমি—কিছু বাড়িয়ে, কিছু বাদ দিয়ে। কেননা, আমার মনে হয়েছে, রবার্ট পেইন কাহিনী পরম্পরা রাখতে পারেননি। ধারাবাহিকতাও থাকেনি।

অব্যাহত থাকবে লিওনার্দোর দূরদৃষ্টি। যেন, ঐতিহাসিক কল্পকাহিনী।

সবশেষে জানাই, নস্ত্রাদামুস তাঁর ভবিষ্যৎবাণীতে 'গঙ্গা'-র উল্লেখ করেছেন। এরিকা চিথাম লিখেছেন, তাঁর গঙ্গা ভারতের গঙ্গানদী নয়—ইউরোপের একটা ছোট্ট শহর। লিওনার্দো কিন্তু গঙ্গাকে নদীই বলেছেন তাঁর ভবিষ্য-কাহিনীতে।

কাহিনীর শুরু পরের সংখ্যায়

লিওনার্দো দ্য ভিন্সির সায়েন্স ফ্যান্টাসি

ম হা প্লা ব ন

সম্পাদনা ঃ অদ্রীশ বর্ধন

প্রথম পরিচ্ছেদ

জার্মানীর দিকে রয়েছে কোমো হ্রদ। এই হ্রদের ওপরে রয়েছে শিয়াভেন্না উপত্যকা। মেরা নদী এই জায়গাতেই গা ঢেলে দিয়েছে কোমো হ্রদে।

এখানে পাহাড় ন্যাড়া। খাড়া। এবড়োখেবড়ো। আর খুব উঁচু। এখানে আছে করমোর‍্যান্ট পাখি—সামুদ্রিক পাখি—যারা খায় খুব বেশি—গলা বড় বেশি লম্বা। আর আছে পাইন আর দেবদারু গাছ—হেথায় সেথায়। আছে ফ্যালো হরিণ—যাদের চামড়ার লালচে-হলদে দাগ গরমকালে সাদা ফুটকি হয়ে যায়। এছাড়াও আছে কৃষ্ণসার হরিণ, বুনো ছাগল আর ভয়ানক ভালুক।

এ পাহাড় বেয়ে উঠতে গেলে আঁকশির দরকার হয়। নইলে পাহাড়ে চড়া সম্ভব নয়। শীতকালে চাষীরা পাহাড়ে ওঠে। ফাঁদ পেতে হরিণ ধরে—তাড়া দিয়ে পাহাড় থেকে নিচে ফেলে দেয়।

এখানে নদী বয়ে গেছে সঙ্কীর্ণ উপত্যকার মধ্যে দিয়ে—দু'পাশের পাহাড় ছুটে গেছে বিশ মাইল পর্যন্ত।

মাইলের পর মাইল ঠেঙিয়ে গেলে পর্যাপ্ত আহার মিলবে সরাইখানার পর সরাইখানায়।

নদীর পাড় বেয়ে ওপরে উঠলে দেখা যাবে একটা জলপ্রপাত—দেখবার মতন জলের ধারা সোজা নেমে গিয়ে আছড়ে পড়ছে ছ'শ ফুট নিচে। বিউটিফুল !

এখানে থাকা-খাওয়ার খরচ খুব কম। যে কোনও সরাইখানায় থেকে গেলেই হলো। দিনে চার 'সোল্ডি' দিলেই হলো।

তবে, ফোনটি মিগলিয়োন গ্রামের বেশির ভাগ বাসিন্দা শিয়াভেন্না উপত্যাকায় নিজেদের আঙুর খেত নিয়ে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রুটির জোগাড় করে নেয়। আমি নিজে থাকি একটা সাদা বাড়িতে। সঙ্গে থাকে আমার ছেলে আর দুই মেয়ে। স্ত্রী মারা গেছে কিছুদিন আগে। এইখানে, বিশাল এবড়োখেবড়ো পাথরের নিচে নিজে চাষ করি নিজের আঙুর খেতের।

প্রতি সন্ধ্যায়, সারাদিনের খাটুনির পর, বসে থাকি ফাদার অ্যানাসটাসিও-র সঙ্গে। ওঁর গির্জা উপত্যকার ঠিক ওপরেই। নানান গল্প করি আর সূর্যাস্ত দেখি।

সেদিন সন্ধ্যায় দু'জনে বসেছিলাম আমার বাগানের বেঞ্চিতে। শুনছিলাম গাঁয়ের মেয়েদের গান। দেখছিলাম, গ্রামবাসীরা কত হুঁশিয়ার পদক্ষেপে আঙুর বাগানের পাশ দিয়ে দিয়ে নীল আর হলুদ রঙিন গলি বেয়ে নেমে আসছে।

একটু পরেই দেখলাম আমার দুই মেয়েকে। ওদের নাম থ্রেসিল্লা আর সেরেলিয়া। ঝুড়ি ভর্তি আঙুর নিয়ে উঠে আসছে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে।

দর্শনশাস্ত্রের কথা বলছিলেন ফাদার। দুই মেয়েকে দেখলেন। হাত তুলে আর্শীবাদ করলেন। আমাদের পায়ের কাছে বসে পড়ল দুজনে। দর্শনের গল্পেই মেতে রইলেন ফাদার।

আস্তে আস্তে সূর্য অস্ত গেল আঙুর ভর্তি খেতের ওপর দিয়ে।

আমি দেখলাম একটা মেঘ। আকারে বিশাল পর্বতের মতন। জ্বলছে আগুন-পাহাড়ের মতন। সূর্যাস্তের লাল আভা যেন অগ্নিশিখা বিলিয়ে দিচ্ছে মেঘের মধ্যে। আশপাশের ছোটখাট মেঘদের শুষে নিজের মধ্যে টেনে নিচ্ছে অতিকায় সেই মেঘ।

সূর্য ডুবে যাওয়ার দেড় ঘন্টা পরেও নিথর হয়ে একই জায়গায় ভেসে রইল সেই মেঘ। মেঘময় শিখর জ্বলতে লাগল সূর্যাস্তের কিরণে।

মেঘটার দিকে আমি ঠায় চেয়েছিলাম মনে আছে, কিন্তু অন্য মেঘের থেকে সে মেঘকে আলাদা মনে করতে

পারিনি। শুধু অবাক হয়েছিলাম। একই জায়গায় অনড় সেই মেঘ অন্ধকারেও দ্যুতি বিকিরণ করে চলেছে।

ইতিমধ্যে বেগুনি হয়ে গেল খেত, তারপর কালো। স্তব্ধ হলো গাইয়েদের শেষ গান। নীরব হলো গির্জের ঘন্টা।

ফাদার অ্যানাসটাসিও যেমন লম্বা, তেমনি রোগা। গালভর্তি দাড়ি ওড়ে বুকের ওপর। প্রায় তিরিশ বছর ধরে পুরুৎগিরি করে আসছেন এই গ্রামে। মধ্যবয়েসে এসেছিলেন মিলান শহর থেকে। নিজের বয়স কত, কক্ষনো তা বলেননি। তবে আন্দাজ করে নিয়েছিলাম সত্তরের কাছাকাছি। দর্শনশাস্ত্রের নানান সমস্যা নিয়ে কথা বলে তিনি আনন্দ পেতেন। এক্সপেরিমেন্ট করতেও ভালবাসতেন। কিছু গ্রামবাসীর মুখে শুনেছি, উনি অ্যালকেমিস্টও বটে। তাঁর ছোট্ট পড়াশুনোর ঘরে ধাতু গলানোর মুচি-পাত্র দেখেছি, দেখেছি পাতনের জন্যে বক-যন্ত্র। কিন্তু নিজেকে অপরসায়নবিদ বলে কখনও জাহির করেননি। বলতেন, মুচি আর বক-যন্ত্র রেখেছেন

পৃথিবীর অবাক ব্যাপারগুলোকে খতিয়ে দেখবার জন্যে—যাতে ঈশ্বরকে প্রণতি জানানো যায়।

সেই সন্ধ্যায় উনি ডাইনিবিদ্যা নিয়ে কথা বলছিলেন। প্রসঙ্গটা কিভাবে উঠল, তা মনে নেই। তবে, আমি কি বলেছিলাম, তা মনে আছে। আমি বলেছিলাম ডাইনিবিদ্যে আর অপরসায়নবিদ্যে একই উৎস থেকে এসেছে।

উনি হেসেছিলেন। হাতের ইসারায় আমাকে হুঁশিয়ার করেছিলেন।

তখন অন্ধকার গাঢ় হয়েছে। বারান্দায় মোমবাতি এনেছে আমার চাকর ম্যাগডালেনা।

উনি বললেন—"আরে না। মানুষ আজ পর্যন্ত যত ব্যাপারে বিশ্বাস রেখেছে, তাদের মধ্যে ডাইনি বিদ্যেতে বিশ্বাস রাখাটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় বোকামি। ডাইনিবিদ্যে যদিও অপরসায়ন বিদ্যের ছোট বোন বললেই চলে, তাহলেও অপরসায়নবিদ্যের চাইতেও বেশি গাল পাড়তে হয় ডাইনিবিদ্যেকে। অপরসায়নবিদ্যে প্রকৃতিজাত জিনিসগুলোকেই খুব সহজভাবে হাজির করছে। ডাইনিবিদ্যে শুধু মিথ্যের জন্ম দিয়ে চলেছে—নিজে যা, তারই সৃষ্টি করে চলেছে। কিন্তু নির্ভেজাল অপরসায়নবিদ্যে প্রকৃতির অসীম ক্ষমতাকে জানতে চাইছে। প্রকৃতির তো যন্ত্রপাতি নেই—মানুষ হাত দিয়ে যা করতে পারে, প্রকৃতি তা পারেনা। মানুষ তাই অপরসায়নবিদ্যে দিয়ে কাঁচ বানাচ্ছে, আরও কত কি তৈরি করছে। ডাইনিবিদ্যে কিন্তু একেবারে আলাদা ব্যাপার। এ যেন একটা ঝলমলে পতাকা—উড়ছে বাতাসে পতপত করে। একটানা আওয়াজ ছেড়ে যাচ্ছে, পাঁচজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেই চলেছে। ওর কাজ ওই পর্যন্ত। ওই পতপতানি আর ঝকমকানি দেখেই বহুজনের বিশ্বাস এসে যাচ্ছে ডাইনিবিদ্যায়—না জানি কি অনন্তশক্তি প্রচ্ছন্ন রয়েছে এর মধ্যে। এ বিশ্বাস বাস্তবিকই অবাক করে দেওয়ার মত ব্যাপার—এমন বিশ্বাস দেখেও তো আর পাঁচজনের মধ্যে বিশ্বাস এসে যায় ডাইনিবিদ্যায়। এই অন্ধ বিশ্বাসের বশেই লেখা হচ্ছে গাদা

গাদা বই—তাতে থাকছে জাদুবিদ্যা আর ভূতপ্রেত-এর হাজারো পিলে-চমকানো গল্প—সেসব ভূতেরা নাকি কথা বলে জিভ ছাড়াই। কথা বলার দেহযন্ত্র না থাকলে কথা বলা যায় না। কিন্তু ডাইনিবিদ্যেতে সবই সম্ভব। এমন প্রেতও নাকি আছে যারা ভারি জিনিস বয়ে নিয়ে যেতে পারে—অথচ তাদের শরীর নেই। তাদের কিছুই নেই, অথচ তারা নাকি ঝড় তুলে পৃথিবী ছারখার করে দিতে পারে, বৃষ্টি নামিয়ে পৃথিবী ডুবিয়ে দিতে পারে, ইচ্ছে করলে মানুষকে বেড়াল কুকুর নেকড়ে অথবা যে কোনও জন্তু বানিয়ে দিতে পারে। একথা যারা বলে, আগে তাদেরই পশু বনে যাওয়া উচিত—এই হলো সার সত্য।"

কথাগুলো বেশ তৃপ্তির সঙ্গে বললেন ফাদার।

আমি বললাম—"ডাইনিবিদ্যে তাহলে একেবারেই অসম্ভব এই যুগে—এই তো বলতে চান ?"

"এই যুগে ! মানে, যে যুগে আমরা রয়েছি ?"

"তা তো বটেই। আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, আগের যুগে ডাইনিবিদ্যে ছিল—তখন তা অসম্ভব ছিল না।"

"কোনওকালেই ডাইনিবিদ্যে নিজের বিদ্যে দেখাতে পারেনি—পারলে সে যুগ নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতই। পৃথিবী নিশ্চিহ্ন করতে গেলে এ-বিদ্যে যে প্রয়োগ করবে, তাকেও তো নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে হবে।"

ফাদারের যুক্তি মেনে নিতে পারলাম না। বললাম—"ঈশ্বর সাজাচ্ছেন—ঈশ্বর ভাঙছেন। গ্রীক দার্শনিক বলেছেন, ধ্বংস কিছুই হচ্ছে না—শুধু রূপান্তর ঘটছে।"

"বেশ, বেশ, তাই যদি হয়, তাহলে তো ডাইনিবিদ্যের গুরু নির্মল স্বচ্ছ বাতাসকে রাতের ঘুটঘুটে অন্ধকার করে তুলতে পারে, প্রচণ্ড আলো আর ঝড় সৃষ্টি করে বজ্র হেনে বাড়ি ঘর চুরমার করে দিতে পারে—সৈন্যদলকে খতম করে দিতে পারে—যুদ্ধজাহাজ ডুবিয়ে দিতে পারে। ঠিকতো ?"

বললাম—"ম্যাজিশিয়ানদের এরকম শক্তি থাকে। জল আগুন বাতাস নিয়ন্ত্রণ করে লণ্ডভণ্ড কাণ্ড করতে পারে।"

"কিন্তু সীমাহীন এই শক্তি মুঠোয় যে আনবে, সে তো পৃথিবীর অধীশ্বর হয়েও বসবে। কোনও মানুষ তাকে ঠেকাতে পারবেনা। পৃথিবীর জঠরের রত্ন সে দেখতে পাবে। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে উড়ে যেতে পারবে—ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্রই তার গতিবিধি হবে অবাধ, কিন্তু যান্ত্রিক প্রতিভার খেল দেখিয়ে তার আখেরে লাভটা কি হচ্ছে ? নিজের মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখা ছাড়া আর কি করতে পারছে ?"

মোমবাতির আলোয় দেখলাম, তন্ময় হয়ে লম্বা দাড়িতে হাত বুলোচ্ছেন ফাদার। এই বিষয়ের আলোচনা তাঁর ভাল লাগছে। বললাম—"সেক্ষেত্রে বলতে হবে, ঈশ্বরের সমান হয়ে উঠছে ডাইনিবিদ্যে অথবা যান্ত্রিক ক্ষমতার অধিকারী। যা খুশি তা করার ক্ষমতা সে পাচ্ছে।"

"পাচ্ছে তো বটেই। তা সত্ত্বেও বলব, এত ক্ষমতা নিয়েও পৃথিবী ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই সে করতে পারবে না—ঈশ্বরের মতন সৃষ্টির ক্ষমতা তার থাকবে না। সে ঈশ্বর হতে পারবে না। এ ক্ষমতা বড় ভয়ানক ক্ষমতা—অত্যন্ত বিপজ্জনক ক্ষমতা। এ ক্ষমতা যার আছে, সে ভাল করতে পারে—মন্দও করতে পারে—কিন্তু সর্বনাশা কাণ্ডই সে করবে—ঈশ্বরের ওপরে যাওয়ার চেষ্টা করবে। ক্ষমতায় মদমত্ত হলে মানুষ ভুলে যায় ঈশ্বরকে। যান্ত্রিক ক্ষমতার ইন্দ্রজাল দেখাতে গিয়ে ঘটবে সেই সর্বনাশা কাণ্ড। তাই বলছিলাম, এমন ক্ষমতাধর মানুষ অতীতে ছিল না—এখনও নেই। বিদেহীদের দিয়ে জাদু দেখানোর একটা সীমা আছে। যাদের দেহ নেই—সেই দেহের জায়গা তো ভ্যাকুম—ভ্যাকুম কখনও ভ্যাকুম অবস্থায় থাকে না—তা ভরাট হয়ে যাবেই। ঈশ্বরের বিধান তাই। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। ঈশ্বরের এই শক্তি করায়ও করতে যে চাইবে—তাকে ঈশ্বরের বিরুদ্ধেই যেতে হবে।"

[ক্রমশঃ]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কথা বলতে বলতে কাউন্ট লোরেনজো'র দুর্গ-প্রাসাদের দিকে বারবার তাকাচ্ছিলেন ফাদার। কাউন্ট লোরেনজো আমাদের এই গ্রামের জমিদার। খুব লম্বাচওড়া মানুষ। একগাল লাল দাড়ি। অনেক যুদ্ধ লড়েছেন এবং জিতেছেন। কিন্তু আমাদের কখনও ঘাঁটাতে আসেননা। শুনছি, ইদানিং তিনি ডাইনিবিদ্যার চর্চা করছেন।

তাই কি ফাদার এই বিষয়ে হঠাৎ মুখ খুলেছেন ? উনি নিজে যদি অপরসায়নবিদ্যার সাধক হন, আর যদি কাউন্ট লোরেনজো ডাইনিবিদ্যার সাধক হন—তাহলেতো প্রচ্ছন্ন রেষারেষি দুজনের মধ্যে থাকবেই।

আমি তো বলেই ফেললাম—"ডাইনিবিদ্যের সাধক যদি তাঁর ক্ষমতার প্রয়োগ ঘটান, তাহলে কি ঘটবে ?"

"আগুন জ্বলবে," গুম-হয়ে বললেন ফাদার,

"কিন্তু একদিন না একদিন ডাইনিবিদ্যে-সাধকের আবির্ভাবতো ঘটবেই। এখন নেই বলে পরেও যে থাকবে না, তা কি বলা যায় ?"

"সেদিন দুঃস্বপ্ন ঘটবে।"

"যথা ?"

"আকাশ থেকে নেমে আসবে ধ্বংস—নীল ওই আকাশ থেকে। ডানামেলে নামবে অগ্নিশিখা—মানুষ পালিয়েও পার পাবে না। সেদিন মানুষের ভাষায় কথা বলবে সব রকমের জন্তু। মানুষ দাঁড়িয়েই থাকবে যে যার জায়গায়—কিন্তু সেই জায়গাই তাকে নিয়ে যাবে পৃথিবীর উল্টোদিকে। মানুষকে নড়তে হবে না জায়গা ছেড়ে—অথচ চক্ষের নিমেষে মানুষ চলে যাবে অন্য জায়গায়। নিবিড় তমিস্রার মধ্যে দেখা যাবে অনেক আশ্চর্য অদ্ভুত ব্যাপার। ক্ষমতায় মদমত্ত ডাইনিবিদ্যের সাধক মানুষের ভাষায় কথা বলে যাবে সমস্ত জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে—জানোয়াররা তা বুঝবে। সে লাফিয়ে নেমে আসবে আকাশ থেকে মাটিতে—অথচ তার কিছুই হবে না। ঢেউ তাকে মাথায় তুলে নিয়ে যাবে দূর হতে দূরান্তরে....তারপর একটা সময় আসবে, যখন কোনও ক্ষমতাই আর থাকবে না তার মধ্যে....."

বলতে বলতে কাউন্ট লোরেনজোর দুর্গ-প্রাসাদের দিকে বারবার চোখ ফেরালেন ফাদার।

আমি বললাম—"বিশ্বাস করেন এ-সব ঘটবে ?"

"করি। সেদিন আর বেশি দূরে নেই।" যেন স্বপ্নের ঘোরে বলে গেলেন ফাদার—"মানুষে মানুষে বিরামবিহীন লড়াই লেগেই থাকবে। ধ্বংস আর মৃত্যু প্রতিদিনের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। ঘৃণা আশ্রয় করবে প্রত্যেককে—সব মানুষকে। এই ঘৃণার বশেই প্রথমে তারা গাছ, বন কেটে সাফ করবে, তারপর খিদের জ্বালায় ব্যাপক পশুহত্যা করে চলবে—মানুষ মারবে মানুষকে স্বদেশ থেকে তাড়াবে। অহঙ্কারে উন্মাদ হয়ে গগনবিহারী হতে চাইবে। জল স্থল অন্তরীক্ষের সব কিছুর দিকেই তারা তাদের আগ্রাসী হাত বাড়িয়ে দেবে—ধ্বংসের হাত থেকে রেহাই দেবে না কিছুই। এক দেশ দখল করবে আর এক দেশকে—দখল করা দেশের মানুষ মেরে সমাধি বানিয়ে রাখবে বিজয়স্তম্ভ হিসেবে। তারা সাগরে ঢুকবে, গহ্বরে প্রবেশ করবে, আকাশে উড়বে—ক্ষমতা তাদের শেষ পর্যন্ত কল্পনাতীত ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে পৃথিবীকে।"

শুনে তো আমার প্রাণ ভয়ে উড়ে গেল।

বললাম—"এরকম ঘটনা যেন আপনার জীবনে ঘটেছে বলে মনে হচ্ছে ?"

"আরে না, আমি স্বপ্ন দেখছি। স্বপ্নে যা দেখা যায়—জেগে থেকে তা দেখা যায় না।"

"একটু আগেই কিন্তু বলেছিলেন, ডাইনিবিদ্যের দৌড় বেশি দূর নয়। বকবকানিই সার।"

"হ্যাঁ, পতপতানি আর ঝকমকানি দেখিয়েই লোকের বিশ্বাস কেড়ে চলবে। তার বেশি কিছু করতে পারবে না। ভগবান যে রয়েছেন, তাঁকে টেক্কা দিতে গেলে অবশ্য যা ঘটবার তা ঘটবে। প্রলয়......প্রলয়।"

হাওয়ার জোর ঠিক এই সময়ে বেড়ে গেল। আমরা বারান্দা থেকে উঠে ঘরে গেলাম। খাওয়া দাওয়া করলাম। ফাদারকে গির্জেতে ছেড়ে দিয়ে এলাম। তখনও দেখলাম, বারে বারে কাউন্ট লোরেনজোর দুর্গ-প্রাসাদের দিকে চোখ ফেরাচ্ছেন ফাদার। আমার তো ওই অন্ধকারেই মনে হলো, দুর্গ-প্রাকারে ঝুঁকে যেন দাঁড়িয়ে রয়েছেন কাউন্ট স্বয়ং। নিরেট অন্ধকার অবশ্য তখন ছিল না—আকাশের কোণে প্রকাণ্ড নিথর সেই মেঘ থেকে একটু একটু আলো তো বেরচ্ছিল।

তার পরের সপ্তাহে এই প্রসঙ্গ নিয়ে আর আলোচনা হয়নি ফাদারের সঙ্গে। গ্রামের শান্ত জীবনধারায় কোনও বিঘ্ন ঘটেনি। চোখের পীড়া সৃষ্টি করে যাচ্ছিল শুধু পুবের ওই মহাকায় মেঘ। দিনের বেলা জ্বলেছে আগুনের গোলকের মতন—রাতে নামলেই একটু একটু করে আগুন নিভিয়ে অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে থেকেছে—কিন্তু জায়গা ছেড়ে নড়েনি একচুলও।

সাত-সাতটা দিন ঠায় এক জায়গাতে থেকে আগুনের মতন আলো বিতরণ করে গেছে টকটকে রাঙা সেই মেঘ। দেখে দেখে আমাদের গা-সওয়া হয়ে গেছে। সত্যিই তো আগুন দিয়ে গড়া নয়—আলোটা আগুনের মতন রাঙা। আগুনের আঁচও ছুঁড়ে দিচ্ছেনা—ঝলসাচ্ছেনা কাউকেই।

সাতদিনের দিন এক ভবঘুরে—ভবিষ্যৎবক্তা লম্বাদাড়ি নেড়ে ঢুকলেন আমাদের গ্রামে। এরকম ভবঘুরে সবজান্তা প্রায়ই আসে। আমরা তাদের কথা একান দিয়ে শুনি, ওকান দিয়ে বের করে দিই। আলখাল্লাধারী শীর্ণকায় এই ভবিষ্যৎবক্তা কিন্তু গলার শির তুলে লাল মেঘ দেখিয়ে হুঁশিয়ার করে গেলেন

আমাদের—"নরক দর্শন ঘটিয়ে ছাড়বে ওই মেঘ ! প্রলয়ের আর দেরি নেই।"

অনেক চেঁচিয়ে-মেচিয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে গেলেন তিনি। কোথায় যে গেলেন, তা আজও আমরা জানতে পারিনি। এসেছিলেন কোত্থেকে, তাও জানিনা। তবে, লাল মেঘ যে আগুয়ান আতঙ্ক—তা তিনি জানতে পেরেছিলেন যেভাবেই হোক—গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটিয়ে দিতেই তিনি নিশ্চয় ছুটে বেরিয়ে পড়েছিলেন—তারপর হয়তো লাল মেঘের স্রষ্টা তা জানতে পেরে তাঁকে ধরাধাম থেকে সরিয়ে দিয়েছে।

তিনি গ্রাম থেকে বিদেয় নেওয়ার পরের দিনই আমাদের দিকে এগিয়ে এল লাল মেঘ। প্রথমে খুব আস্তে, তারপরে দ্রুত। আকাশ তখন নীল, তা সত্ত্বেও উঠল ঝড়। সে ঝড় কিন্তু ওই মেঘ থেকে তেড়ে এল না। রাতে শুনলাম ঝড়ের হুঙ্কার। দাপট কি সেই ঝড়ের। যেন হিংস্র জিঘাংসায় উন্মত্ত—ঘরে বসেই

শুনলাম মাতামাতি জুড়েছে আঙুরের খেতে—চালিয়ে যাচ্ছে লণ্ডভণ্ড কাণ্ড। তারপরের দিন আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল সেই প্রভঞ্জন—যেন পাশব শক্তি নিয়ে লাফিয়ে পড়ল আমাদের শান্ত সুন্দর ছোট্ট গ্রামটার ওপর। যেন চাবুকের শনশনানি শোনা গেল সবদিকে। খাড়াই পাহাড়ের ওপর থেকে চাকলা চাকলা পাথর খসে পড়ল আঙুর খেতে—উত্তর-পুবের ওয়াচ-টাওয়ার মিশে গেল মাটিতে। গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে গেল গোটা তল্লাট। শেষকালে মোমবাতি জ্বালিয়ে বসে থাকতে হলো, কনকনে হাওয়ার ঝাপটা আরও অসহ্য হয়ে উঠল, ঝড়ের গোঙানিকে মনে হলো যেন পৃথিবীর গোঙানি—পাহাড় পর্বতের অন্তরের যন্ত্রণার ঝনঝনানি, ঘরের মধ্যে জ্বলন্ত মোমবাতির শিখাও যেন নিভু-নিভু হয়ে এল অবর্ণনীয় সেই গোঙানি-ধ্বনিতে যা কখনও এর আগে ঘটেনি। তারপরেই মুহুর্মুহু চোখ-ধাঁধানো বিদ্যুৎ চমকের পর বিদ্যুৎ-চমক আরও ম্লান করে তুলল মোমবাতির আলোকে।

আতঙ্কে দিশে হারা হয়ে আমি ছুটে গেছিলাম গির্জেতে প্রার্থনার জন্যে। কিন্তু কী ভয়ানক কাণ্ড ! প্রার্থনারত অবস্থাতেই দেখলাম, গির্জের দেওয়াল চৌচির হয়ে ভেঙে ভেঙে পড়ছে।

দেওয়ালে ফাটল ধরবার সময়েই ছেলেমেয়েদের নিয়ে বেরিয়ে পড়বার মতলব করেছিলাম—তাই দেওয়াল মাথায় ভেঙে পড়বার আগেই বেরিয়ে এসেছিলাম বাইরে।

ঝড়ে তাণ্ডব ভাষা দিয়ে ফোটাতে পারব না—না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। কানে আসছিল হাজারো অদ্ভুত গুজব। সরোবর ঘিরে নাকি আগুনের গোলা নেচে নেচে বেড়াচ্ছে। অগুন্তি সর্পাকৃতি দানব কুয়োর ভেতর থেকে উঠে আসছে। রহস্যময় সেই ভবিষ্যৎ বক্তাকে গ্রামের আনাচে-কানাচে দেখা যাচ্ছে—ভাঙা পাঁচিল বেয়ে ওপরে উঠে, শূন্যে হাত নেড়ে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে যাচ্ছে।

শেষের গুজবটা হয়তো গুজব নয়—সত্যি। আমার ছেলেও নাকি তাকে দেখেছে। গির্জে ছেড়ে যখন পালিয়ে আসছিলাম, তখন সে নাকি মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে মুঠো তুলে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছিল—নিপাত যাক ! নিপাত যাক দুনিয়া ! এসে গেছে প্লেগ।”

প্লেগ কি জিনিস তা জানি। এর আগেও প্লেগ এসেছিল। কিন্তু সেদিন যা শুরু হয়েছিল, তা প্লেগ নয়। সেকালে যখনই শুনতাম, ব্ল্যাক প্লেগ আসছে এশিয়া থেকে, আমরা খিল তুলে ঘরের মধ্যে বসে থাকতাম, ধুনো দিতাম, আর পশুমাংস খেতাম না।

কিন্তু সেদিনের কাণ্ড একেবারেই সৃষ্টিছাড়া—এরকম ব্যাপার আগে কক্ষনো ঘটেনি। প্রকৃতির শক্তি প্রয়োগ করা হয়েছে নরমেধ যজ্ঞর জন্যে। লাল আগুনে-মেঘ দিনের বেলায় এসে গেছে মাথার ঠিক ওপরে—মৃত্যু নেমে আসছে সেই মেঘের মধ্যে থেকে। রাত্রে কালো ঘন নিরেট অন্ধকার ছাড়া কিছুই দেখা যাচ্ছেনা।

এক হপ্তাও গেল না—সাবাড় হয়ে গেল অর্ধেক গ্রাম। চারিদিকে শুধু বিলাপ হাহাকার, আর্তনাদ আর যন্ত্রণাময় চিৎকার। পাথরের ঘায়ে যারা ছিটকে পড়েছিল, কুঁচকে গুটিয়ে এতটুকু হয়ে গেছিল তাদের শরীর ; বজ্রাঘাতে যারা মারা গেছিল, অদ্ভুত বেগুনি চিহ্ন দেখা গেছিল তাদের সারা দেহে। কারও গা বড় বড় ফোস্কায় ছেয়ে গেছিল—লাল টকটকে ফোস্কা—আপনা আপনি ফুলে উঠে ফেটে গেছে আপনা থেকেই। ধূলিসাৎ হয়েছিল দেওয়াল, পাথরের তলায় প্রাণ হারিয়েছিল অসংখ্য মানুষ।

তারপরেই, একরাতে তিরিশ ফুট নিচে পিছলে নেমে গেল গোটা গ্রাম।

একই সঙ্গে এক নদী বারো নদীর রূপ নিল—ধ্বংসস্তূপের ওপর দিয়ে বারো দিকে ধেয়ে গেল বারোটা স্রোতধারা।

[ক্রমশঃ]

লিওনার্দো দ্য ভিন্সির সায়েন্স ফ্যান্টাসি

ম হা প্লা ব ন

সম্পাদনা ঃ অদ্রীশ বর্ধন

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

থরথর করে কাঁপতে লাগল ধরণী—যেন, দাঁতে কামড়ে ধরে ঝাঁকুনির পর ঝাকুনি দিয়ে বেড়াল মারছে ইঁদুরকে।

বড় বড় গহ্বর মুখ ব্যাদান করল ভূ-পৃষ্ঠে—নদীর শাখা-উপশাখা গিয়ে ঢুকল কিছু গহ্বরে—অন্য গহ্বর থেকে হুড়হুড় করে বেরিয়ে এল পাতালের জল। কখনও সে জল ফুটন্ত জল, গন্ধকময় জল ; আবার কখনও তার বরফগলা জলের মতন কনকনে ঠাণ্ডা।

যেন, ম্যাজিশিয়ান জাদুদণ্ড নেড়ে অত্যাশ্চর্য ইন্দ্রজালের পর ইন্দ্রজাল দেখিয়ে চলেছে। আর, তার পরেই পর্বতচূড়া ফেটে উড়ে গিয়ে বিশাল হাঁ তুলে ধরল আকাশের দিকে।

প্রকৃতির ভয়ানক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে ভেল্‌কি দেখিয়ে চলেছে বুঝি নিষ্ঠুর ঐন্দ্রজালিক—আড়ালে বসে।

এরই মধ্যে কোনমতে টিঁকে রইলাম। জানি, যা ঘটছে তা প্লেগ নয়—কিন্তু মহামারীর মতনই মানুষ মেরে চলেছে অকাতরে। কাতারে কাতারে লোক আসছে গাড়ি ভর্তি পিচ নিয়ে—রাস্তার দফারফা হয়ে গেছে—তবুও ভাঙা রাস্তার ওপর দিয়েই নাচতে নাচতে আসছে গাড়ির পর গাড়ি—মশাল জ্বলছে সেই পিচ দিয়ে—পটপট শব্দে কানে তালা লেগে যাচ্ছে। যে বাড়ির মানুষ মরছে, সেই বাড়ির দরজা গলা পিচ দিয়ে ঢেকে, তার ওপর খড়ি দিয়ে সাদা ক্রুস চিহ্ন এঁকে দিচ্ছে। যারা বাড়ির ভেতরে ঢুকছে, তারা মুখোশ পরে নিচ্ছে মুখে, হাতে রাখছে লোহার আঁকশি আর কয়লা তোলার চিমটে। হাত দিয়ে স্পর্শ করছে না মরা। ঝড়ের হুঙ্কার যত বাড়ছে, গরু, ছাগল, মোষ, ঘোড়া তত গোঙাচ্ছে—তত জোরে বেজে চলেছে গির্জের ঘন্টা। দিবারাত্র—বিরাম নেই। যেন পাগলা-ঘন্টি। অথচ, ঘন্টার দড়ি টানবার লোক নেই গির্জেতে ! ঘন্টা-ঘর তো গির্জে থেকে রয়েছে একটু তফাতে—অন্ধকারেও দেখতে পাচ্ছি, সামনে পেছনে টলছে সেই ঘন্টা-ঘর আর ঘন্টা বাজিয়ে চলেছে ঢং ঢং—এত প্রলয়ের মধ্যে ঘন্টা-ঘর কিন্তু ভেঙে পড়েনি। প্রলয়ঙ্কর ঝড়ে শুধু দুলছে আর দুলছে—কিন্তু ধরণী আশ্রয় করছে না !

একটা গুজব কিন্তু নিরন্তর শুনেই চলেছি। রহস্যময় সেই ভবিষ্যৎ বক্তাকে নাকি এখনও এখানে-ওখানে দেখা যাচ্ছে। মুখে তাঁর একটাই কথা—"মর, মর, দলে দলে মর ! বাঁচতে যদি চাস, চলে যা প্রাচ্যের শ্বেতপর্বতে—শান্তি পাবি সেখানে।"

এটা গেল একটা গুজব। আর একটা গুজব, ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা নাকি কোনকালে খতম হয়ে গেছে নিজেই পাথর চাপা পড়ে।

কিন্তু একটা কিছু তো করা দরকার। এবং তা করা দরকার আর দেরি না করে। খুঁজতে বেরলাম ফাদারকে। গির্জের মধ্যেই পেলাম তাঁকে। গির্জে আর নেই—ধ্বংসস্তূপে বসে প্রার্থনা করে চলেছেন। বয়স যেন আরও বেড়ে গেছে—যেন থুত্থুরে বুড়ো হয়ে গেছেন—প্রথম দর্শনে তো চিনতেই পারিনি। ধুলোয় হলদে হয়ে গেছে পরনের যাজক-পরিচ্ছদ। মাথার ওপর জ্বলছে অগ্নিগর্ভ সেই মেঘ। আমাকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন অতিকষ্টে। চোখ বিস্ফারিত। হাতে ক্রুশ—অশুভ শক্তিকে কাছে ঘেঁষতে দিচ্ছেন না।

বললাম—"ক্ষেত বলে আর কিছু নেই। অর্ধেক মানুষ শেষ।"

"প্রার্থনা করা ছাড়া আর কিছু করার নেই," গনগনে চোখে তাকিয়ে বললেন ফাদার।

"শ্বেত পর্বতে নাকি শান্তি পাওয়া যাবে—"

বাজে কথা। প্রার্থনা করা ছাড়া আর পথ নেই—থাকতে হবে এখানেই, "বলে, আমাকে টেনে নিয়ে গেলেন বেদির পেছনে একটা খুপরি ঘরের মধ্যে।

নাছোড়াবান্দা গলায় বললাম—"প্লেগ নয়, প্লেগ নয়—এতো ডাইনিবিদ্যের মারণ-যজ্ঞ।"

ভারি বাইবেলটা এক হাতে তুলে নিলেন ফাদার, আর এক হাতে মাঝখান থেকে খুলে ধরলেন—ঈশ্বরের নির্দেশ সঙ্কটকালে দেখবার নিয়ম তো এইটাই।

পড়ে গেলেন—"হাতির দাঁত দিয়ে গড়া প্রাসাদে শুধু সুগন্ধ—তোমার পোশাক হবে সুরভিত—পাবে শান্তি।"

"মানে ?"

"ভবিষ্যৎবক্তা হয়তো যথার্থ কথাই বলেছেন। শ্বেত পর্বতকে এখানে বলা হচ্ছে আইভরি প্যালেস। প্রাচ্যের পর্বত। এখানে থাকা আর উচিত নয়। রওনা হওয়া যাক।"

পরের দিন যে-কজন গ্রামবাসী বেঁচে ছিল, তাদের জড়ো করলাম। বললাম—"লাল মেঘ হয়তো গোটা পৃথিবীকে ধ্বংস করে ছাড়বে। তার আগেই চলো যাই প্রাচ্যদেশের শ্বেতপর্বতে। কপালে কি আছে, দেখা যাক।"

শুরু হলো যাত্রা। গাড়ি, ঘোড়া, রসদ নিয়ে। রাস্তা যেখানে নেই, সেখানে ঘুরপথে গেলাম। গ্রাম দেখলে পাশ কাটিয়ে গেলাম। উঁচু পাহাড়ের আড়ালে নিরাপদ বোধ করলাম—বিশেষ করে যখন আগুনের স্তম্ভ চোখের আড়ালে চলে গেল। চললাম....চললাম পুব দিকে—যেখানে আছে শান্তি.....আছে নিরাপত্তা।

আজ এতদিন পরে সুদীর্ঘ সেই তীর্থযাত্রার কথা যখন মনে করতে চেষ্টা করি, গায়ে কাঁটা দেয়। দেখেছি কত অবাক করা দৃশ্য, কত ভয়ানক দৃশ্য, কত করুণ দৃশ্য। আঁচ লেগেছে আমাদের গায়েও—ঈশ্বর কৃপায় পেরিয়ে যেতে পেরেছি সমস্ত অঘটন আর দুর্বিপাক—নিশ্চিত মরণ পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেছে অসংখ্যবার। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি অশ্বারোহীদের সেই দীর্ঘ মিছিল, যে মিছিলের মধ্যে রয়েছে ঘোড়ায় টানা গাড়ি, রেশমি
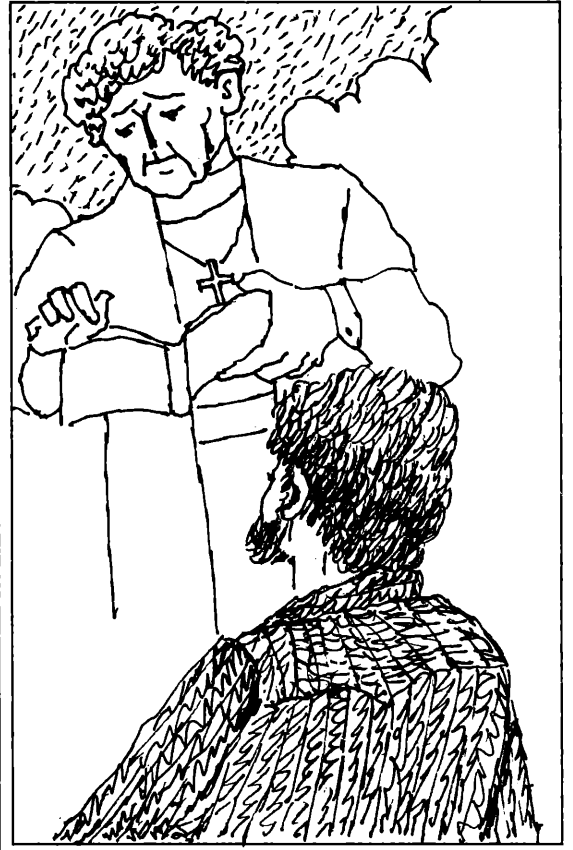
পোশাক পরা নারী, বলদ আর গাভী—মাথার ওপর নীল আকাশ। খাঁ-খাঁ করছে ধরিত্রী—মানুষ, পশু-পাখি নেই কোত্থাও। নিস্তব্ধ নিথর চরাচর। বুক শুকিয়ে যাওয়ার মতন অভাবনীয় সেই দৃশ্য মন থেকে মুছে যাবে না কোনদিনই। মিছিল নিয়ে গেছি পোড়া, আর মাটির সঙ্গে মিশে যাওয়া গুঁড়ো গ্রামের পাশ দিয়ে, কখনও-সখনও দেখেছি, পাহাড়ের ওপর দিকে সামান্য কিছু মানুষ উঠে বসে রয়েছে—তখনও বেঁচে রয়েছে—প্রলয় যখন গ্রাস করছে সব কিছু, তখন নিশ্চয় হাঁচড়-পাঁচড় করে উঠে গেছিল দোলায়মান পাহাড়ের পাথর ধরে ধরে। মাঝে মাঝে ধোঁয়াও দেখেছি—সে জায়গা থেকে চটপট চম্পট দিয়েছি। কারণ, ধোঁয়া যারা জ্বালিয়েছে, নিশ্চয় তাদের মাথার ঠিক নেই। পাগলদের প্রলাপ শোনবার সময় তখন ছিল না।

এইভাবেই উত্তর ইটালির নানা পথ বেয়ে এগিয়ে

গেল আমাদের ঘোড়ার দল তাদের সিল্কের মতন কেশর হাওয়ায় দুলিয়ে। হাতে হাতে রইল বল্লাম, তলোয়ার আর আঁকশি-আঁটা লম্বা লাঠি—আত্মরক্ষার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হয়েছে অষ্টপ্রহর। পবিত্র আধার তুলে ধরে রেখেছিলাম মাথার ওপর, চিতা আর সিংহ হেঁটে গেছে পাশে পাশে—যেন, অদৃশ্য শত্রুদের ঠেকিয়ে রেখেছে তফাতে—অন্তত সেইরকমই মনে হয়েছিল আমার—ঈশ্বরের বিশেষ নির্দেশ ছিল যেন তাই। শুধু আমরাইতো সজীব—আশেপাশে সব মৃত। আরবদের মতন সিল্কের স্কার্ফ দিয়ে মাথা আর মুখ ঢেকে রেখেছিলাম—বেরিয়েছিল শুধু চোখ। গ্রামের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময়ে মড়ার গাদা দেখে লরেল আর লেবু পাতা নাকের কাছে ধরে রেখেছি। আর ভেবেছি, প্লেগ তো এশিয়া থেকেই বরাবর এসেছে, তবে কেন চলেছি প্রাচ্যদেশের দিকে ?

ডালমেশিয়ান উপকূলে যখন পৌঁছলাম, শীত ততদিনে জেঁকে বসেছে। পাতলা কুয়াশায় চারদিক ছেয়ে গেছে। নৈঃশব্দ নিবিড়তর হয়েছে। গোটা পৃথিবী ঘুমোচ্ছে, ফের জাগবে কিনা জানা নেই। সবই শেষ হয়ে গেছে, কি এক অলৌকিক শক্তি শুধু আমাদের ক'জনকে বাঁচিয়ে রেখেছে। নিরেট এই নৈঃশব্দকে তরল করে দেওয়ার জন্যে বাদ্যকরদের বাজনা বাজিয়ে যেতে বললেন ফাদার। এই মড়ার জগতে যেন প্রাণের হিল্লোল ছড়িয়ে পড়ে—এই উদ্দেশ্যে ভূত তাড়ানোর জন্যে নয়। মাথার ওপর দিয়ে সবুজ সারস চলেছে মিশরের দিকে—মাঝে মাঝে বিপরীত দিক থেকে একা-একা উড়ে আসছে রাজহাঁস। উড়ন্ত জীবন্ত সুন্দর এই বিহঙ্গদের দেখেও মন কিন্তু সরস হচ্ছে না। মনে হচ্ছে, শুধু আমরাই বন্দী এই পৃথিবীর কারাগারে—পাখিরা মুক্ত, খেলছে স্বর্গীয় বাতাসে। আমরা চলেছি শ্বেত পর্বত অভিমুখে—জানিনা সে পর্বত কোথায়। সেকি অলিম্পাস পাহাড় ? নাকি, ক্যাসপিয়ান সাগরের তীরের সুউচ্চ হিরক্যানিয়া পাহাড় ? পূর্বাভাষ দেখা যায় কিনা, আমরা নজর রাখলাম সেদিকে। কখনও ধুলো পরীক্ষা করেছি, কখনও স্বপ্ন বিচার করেছি। কখনও দেখেছি মরীচিকা। খাবারের ভাঁড়ার বোধ হয় ফুরিয়ে আসছিল, তাই দৃষ্টিবিভ্রম ঘটেছিল। দিনের পর দিন ঘোড়া হাঁকিয়ে গেছি ডালমেশিয়ান উপকূল বরাবর এইভাবে। কুড়িয়েছি শামুক—তাজ্জব হয়েছি খোলার ওপরকার বিচিত্র কারুকাজ দেখে। সমুদ্র তাদের ধুয়ে মুছে খোদাই করে রত্নের মতন রেখে দিয়েছে—অথচ তারা কঙ্কাল ছাড়া কিছুই নয়—এরকম ভাবে সমুদ্রবিহারী নাবিকদের কঙ্কালও তো সমুদ্র রেখেছে নিজের রত্নভাণ্ডারে।

একদিন গোটা সমুদ্র বরফ হয়ে গেল চোখের সামনেই। আমরা ভাবলাম, এই কি সেই শ্বেতপর্বত ? জবাব খুঁজে পাইনি। দেখেছিলাম, বিশাল তরঙ্গ জমে বরফ হয়ে গিয়ে নিস্পন্দ স্ট্যাচুর মতন দাঁড়িয়ে গেছে। বরফচূর্ণ হওয়ার ভয়ানক শব্দও কানে ভেসে এসেছে।

সমুদ্রকে বরফ হয়ে যেতে কখনও দেখিনি। জমাট তরঙ্গর ওপরে উঠে গিয়ে নিচে নেমে এলেন ফাদার—পবিত্র জল ছিটিয়ে দিলেন মৃত সমুদ্রে। মরীচিকা দর্শন কিন্তু অব্যাহত রইল। একটু একটু করে উষ্ণতর হলো দিন—অবশেষে এসে পৌঁছোলাম গ্রীসদেশের উপকূলে।

মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল গাংচিল। সমুদ্রের দিকেই গেল, অথচ সেদিকে দেখলাম না কোনও জাহাজ। একা...একা... বড় একা আমরা এই ক'জন বিপুলা এই ধরণীতে। দু'মাস হলো চলেছি—মানুষের বসতি চোখে পড়েনি। শুধু ধ্বংসস্তূপ—পথের পাশে মড়া। যে পথ মাড়িয়ে চলেছি, এই পথ দিয়েই নিশ্চয় মহাতঙ্ক প্লেগ গেছে তার ধ্বংসের ধ্বজা উড়িয়ে।

আমরা দিনের বেলা পথচলা বন্ধ করেছিলাম—চলতাম শুধু রাতে। একদিন ভোরের দিকে বিশ্রাম নেওয়ার জন্যে যেই থেমেছি—তীর থেকে মাইল তিনেক দূরে দেখলাম একটা জাহাজ। খুব মজবুত জাহাজ বলেই মনে হলো এতদূর থেকেও—পাল বেগুনি রঙের—খোল কালো রঙের।

[ক্রমশঃ]

লিওনার্দো দ্য ভিন্সির সায়েন্স ফ্যান্টাসি

ম হা প্লা ব ন

সম্পাদনা ঃ অদ্রীশ বর্ধন

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আশ্চর্য সুন্দর সেই জাহাজের দিকে মুগ্ধ চোখে আমরা চেয়েছিলাম। অনেক আশা মনে। আবার ভাবছি, আর একটা মরীচিকা নয়তো ? আকাশ নীল—দিগন্তের দিকে সবুজাভ। গ্রীক আকাশ এইরকমই নির্মল হয় শুনেছিলাম আগেকার মানুষদের মুখে। অলিভ বৃক্ষের মতন নিথর সেই ঊষাকালে ধীরছন্দে স্পন্দিত সবুজ সেই সমুদ্র মনের পটে স্থায়ী চিত্র এঁকে গেছে। ওই জাহাজ শত্রুর, না, মিত্রের—এই নিয়ে জল্পনা-কল্পনা শুরু করেছিলাম নিজেদের মধ্যে। ফাদার যেভাবে রত্নখচিত ক্রুশ তুলে ধরেছিলেন দূরের সেই জাহাজের দিকে—দেখেতো আমার চকিতের জন্যে সন্দেহ দানা বেঁধেছিল মনের মধ্যে, ডাইনিবিদ্যেতে ওঁরও পারদর্শিতা আছে নাকি ? কেননা, এই ভঙ্গিমায় অর্ণব অভিমুখে আশীর্বাদ বর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে আট-দাঁড়-ওলা একটা পানসি নৌকো জাহাজ থেকে নামল সমুদ্রে—এল আমাদের দিকে।

গ্রামবাসীরা ততক্ষণে জড়ো হয়েছে আমাদের ঘিরে। বলছে সহর্ষে—"মরুচিকা ! ফের মরীচিকা !"

"মরীচিকা নয়, মরীচিকা নয়—শয়তানের ভেলকি। কাল রাতেতো দেখিনি," বললে অন্য দল।

কাঁচের মতন নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের ওপর দিয়ে আরও কাছে চলে এল পানসি। দাঁড়িদের সোনার শিরস্ত্রান স্পষ্ট দেখতে পেলাম। সবাইকে বললাম—"বাজে কল্পনা না করে স্তোত্রপাঠ করো—স্বাগতম জানাও।"

তাই করা হলো।

পানসি থেকে লাফিয়ে তীরে নামল প্রথম যে-জন, বয়েসে সে তরুণ, গালে জমাট কালো দাড়ি, মাথায় সোনার শিরস্ত্রাণ, অঙ্গে গাঢ় লাল রঙের আলখাল্লা, বুক আর পিঠ ঢাকা ব্রোঞ্জের বর্মে, কোমরের বেল্টে তরবারি। আটজন দাঁড়ির বেশভূষাও একরকম—সশস্ত্র প্রত্যেকেই। পানসি থেকে লাফিয়ে তীরে নামতেই ধাতুর ঝনঝনানিতে ভয় পেয়ে পেছিয়ে গেল গ্রামবাসীরা। জাহাজের কালো কাঠের মতন কালো কাঠ দিয়ে তৈরি পানসির গলুইতে এক দেবতার মুখ—থমথমে চাহনি। তরুণের গলা ঘিরে ঝুলছে মুক্তোর মালা। চালচলন রাজকীয়। হুকুম করার জন্যেই তার জন্ম। চাহনি তীব্র। কিন্তু আমাদের দেখে নিল দুই চোখে বিপুল আনন্দ ভাসিয়ে।

বললে সুগম্ভীর স্বরে—"আমি আসছি ব্যাবিলন-সুলতানের লেফটেন্যান্ট সিরিয়া-অধিপতি দিওদার-এর কাছ থেকে। উনি জানতে চান, আপনাদের কিভাবে আমরা সাহায্য করতে পারি।"

এরপর তার মুখেই জানলাম, গোটা ইউরোপকে প্লেগ শেষ করে দিয়েছে—আমাদের দেখতে পাওয়ার আশা ওদের ছিল না।

জিজ্ঞেস করল সবশেষে—"গ্রীস উপকূলে এলেন কি করে ?"

"লঙ মার্চ করে," জবাব দিলাম আমি।

তারপর বললাম সব কথা। লাল মেঘের কথা। আমাদের বেঁচে যাওয়ার কথা। শ্বেতপর্বত অভিমুখে আমাদের অভিযানের কথা।

হাসল তরুণ। সুমিষ্ট হাসি। বললে—"আসুন জাহাজে। প্রভু দিওদার-এর সঙ্গে রুটি খেয়ে যান।"

যে-ক'জন পারলাম, ঠেলেঠুলে পানসিতে উঠে পড়লাম—বাকি সবাই রইল তীরে।

যেতে যেতে বললে তরুণ রাজপুত্র—"ওই তীরে খুব জোর বেঁচে গেছে শ'দুই মানুষ—বাকি সবাই পালিয়েছে পাহাড়ে।

জাহাজের কাছে চলে এল পানসি। দেখলাম, সারি

সারি কামান নিয়ে দাঁড়িয়ে গোলন্দাজরা। মাস্তুলে উড়ছে একটা মস্ত সোনালি পতাকা।

ওপরের ডেকে উঠলাম। দেখলাম, সিংহাসনে আসীন আশ্চর্য সম্ভ্রান্ত দর্শন সেই পুরুষকে। ব্যজন করছে ক্রীতদাসরা। সামনে নাচছে সিল্কের লম্বা পোশাক পরা মেয়েরা। বাজনা বাজাচ্ছে বাদকরা। তাঁর গাল বোঝাই ভেড়ার উলের সাদা দাড়ি—যেমন থাকে মিশরের ফারাওদের গালে। বুকের সোনার প্লেটে খোদাই করা সিংহের প্রতিমূর্তি। এক হাতে সোনার মুকুট, আর এক হাতে চক্র আর রাজদণ্ড। পাশে দাঁড়িয়ে গ্রীবা ঝাঁকাচ্ছে আর পা ঠুকছে নীল রঙের একটা আরবী ঘোড়া—দিওদার তার গায়ে হাত বুলিয়ে যাচ্ছেন—যে হাতে রয়েছে রাজদণ্ড—সেই হাত দিয়ে। তাঁর বয়স প্রায় তিরিশ। মুখমণ্ডল বিরাট, চক্ষু কোটরে বসানো—দেখলেই বোঝা যায়, অসীম ক্ষমতা তাঁর মুঠোর মধ্যে। গায়ের রঙ খুবই কালো—এই কৃষ্ণবর্ণই তাঁকে আরও রাজকীয় করে তুলেছে। বেগুনি পালের তলায় বেগুনি ছায়ায় বসে প্রত্যাশাপূর্ণ চোখে চেয়ে আছেন আমাদের দিকে।

ফাদার রত্নখচিত ক্রুশ বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—"যিশু যে ক্রুশ-কাঠে দেহ রেখেছেন, সেই কাঠের টুকরো আছে এর মধ্যে।"

উঠে দাঁড়ালেন দিওদার। আলিঙ্গন করলেন ক্রুশ। বিলক্ষণ সম্মান জানিয়ে আমাদের বসতে বললেন তাঁর পায়ের কাছে। খাবার এনে দিল ক্রীতদাসরা। ঠিক সেই সময়ে পাল ফুলে উঠল হাওয়ায়। তিনি বললেন—"লক্ষণ শুভ"।

তারপর শুনলেন আমাদের কাহিনী।

শুনলেন আমরা চলেছি এশিয়ার শ্বেত পর্বতের সন্ধানে।

সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন। এই জাহাজেই রওনা হওয়ার আমন্ত্রণ জানালেন।

বললেন—"প্লেগ সমুদ্রকে ছুঁতে পারেনি। সমুদ্রযাত্রায় নিরাপত্তা হয়েছে। ডাঙা থুকথুক করছে

মড়কে। শ্বেত পর্বত প্রসঙ্গে বলি, সাইপ্রাসের গায়ে সিলিসিয়া-য় রয়েছে সবচেয়ে উঁচু পাহাড়, পায়ে হেঁটে সেখানে যাওয়া যায়। পেরা-র ব্রীজ পেরিয়ে এশিয়া মাইনরে ঢুকতে হবে।"

আমরা জাহাজে যাওয়ার আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম।

তারপর জিজ্ঞেস করলাম—"আপনি আসছেন কোথা থেকে ?"

"ব্যাবিলন থেকে।"

"ব্যাবিলন কোথায় ?"

"গঙ্গানদীর তীরে—বিরাট শহরে," বলে বিরাট মানচিত্র খুলে দেখালেন—"এইখানে রয়েছে ককেসাস পাহাড়। এই দেখুন দুটো পর্বতমালা—গিয়ে মিলেছে ব্যাকট্রিয়া আর ইণ্ডিয়ার মাঝামাঝি জায়গায়। ওক্সাম নদী জন্ম নিয়েছে এই পাহাড় থেকে, বয়ে গেছে পঁচিশ মাইল উত্তরে—গেছে উত্তরে-ও, পড়েছে হিরকানিয়ান সাগরে। এ ছাড়াও রয়েছে আরও বড় বড় নদী—ওসাস, ড্র্যাগোডোস, আতামিস, জ্যারিয়াসপিস, ড্র্যাগামেইম

আর মার্গাস। দক্ষিণে দেখুন—রয়েছে বিশাল নদী ইণ্ডাস—ছ'শ মাইল দক্ষিণে বয়ে গিয়ে পুব, পশ্চিম, উত্তর থেকে বয়ে আসা অনেকগুলো শাখানদীকে বুকে ধারণ করেছে। মহাকায় হয়ে বয়ে গেছে আটশ মাইল পশ্চিমে আরবেতি পাহাড়ের কাছে কনুই-বাঁক নিয়ে আরও পাঁচশ মাইল গিয়ে মিশেছে ইণ্ডিয়ান মহাসাগরে—সাত মুখে জল ঢেলে দিয়েছে।

"এবার দেখুন, এই সব পাহাড় থেকেই জন্ম নিয়েছে বিশাল গঙ্গা—দক্ষিণে বয়ে গেছে পঁচিশ মাইল, দক্ষিণ-পুবে গেছে আরও এক হাজার মাইল—চারটে নদী এসে মিশেছে মূল জল ধারায়। আর, এইখানে দেখুন গঙ্গার পাড়ে দাঁড়িয়ে ব্যাবিলন।"

স্তম্ভিত বিস্ময়ে শুনেই গেলাম। যে-সব নাম বলে গেলেন—তা কখনও শুনিনি। টলেমি নিশ্চয় তাঁর তৈরি ম্যাপে দেখিয়ে গেছেন।

সেইদিনই সন্ধ্যায় জাহাজ আমাদের নিয়ে রওনা হলো শ্বেত পর্বতের দিকে। বিরাট জাহাজ। আমাদের সমস্ত গাড়ি আর পশু যেন হারিয়ে গেল সেই জাহাজে।

পনেরো দিন পরে পৌঁছোলাম সাইপ্রাস দ্বীপে। দেখলাম, অগুন্তি জাহাজ দ্বীপের গায়ে আছড়ে পড়ে ভেঙে খান খান হয়ে গেছে। গোটা দ্বীপ ঘিরে শুধু জাহাজের কঙ্কাল।

বিপজ্জনক সেই সৌন্দর্য দেখে বুক কেঁপে উঠেছিল আমার। এ দ্বীপ নিরাপদে প্রদক্ষিণ করতে পারব বলে মনে হয়নি। উত্তর দিকে যেতেই আচমকা নরম মেঘ সরে গেল দু'পাশে—দেখলাম, খুব উঁচু একটা সাদা পাহাড়—চূড়ো ঢেকে ঝকঝকে বলয় এমন চোখ ধাঁধানো দ্যুতি বিকিরণ করে যাচ্ছে যে তাকানো যাচ্ছেনা।

পাহাড়ের সানুদেশে রয়েছে ক্যালিনড্রা শহর। সমুদ্রের উপকূলে। দেখলাম, বালুকাভূমি মাড়িয়ে দলে দলে মানুষ আসছে আমাদের দিকে। মাথায় চওড়া-কিনারা টুপি—রোদ আটকানোর জন্যে। বড় সুন্দরদেহী মানুষ তারা। যেন পেটাই ব্রোঞ্জ দিয়ে গড়া শরীর। পেছনে আসছে পোষমানানো বাঘ আর সিংহ। তাদের পেছনে ঝকঝক করছে সাদা শহরের ফোয়ারা আর বাগান। আঁজলা ভরে ফুল এনে, হেঁকে সাদর আহ্বান জানাচ্ছে আমাদের কাতারে কাতারে মানুষ। বুঝলাম, অবশেষে পৌঁছেছি শ্বেত-পর্বতে।

দিওদার বললেন আমাকে—"এই শহর আমার সাম্রাজ্যের মধ্যে পড়ে। এতদিন উপযুক্ত গভর্নর পাইনি। তোমাকে গভর্নর নিযুক্ত করলাম। শহরের দেখভাল করবে, পাহাড়ে উঠবে। আমার নীল ঘোড়া উপহার দিলাম তোমার ছেলেকে। আর দিচ্ছি এই খাঁচা ভর্তি পায়রা—যখনি আমাকে কিছু জানানোর দরকার হবে, পায়রার পায়ে চিঠি লিখে উড়িয়ে দেবে। আমি চললাম—দেখি, আর কোথাও মানুষ বেঁচে আছে কিনা—কোনও দেশকে বসতির উপযোগী করা যায় কিনা।"

ক্যালিনড্রা শহর সত্যিই বড় সুন্দর শহর। পৃথিবীতে এমন শহর আর নেই। এ শহরের বাগানগুলো সমুদ্রের দিকে। মানুষরা সুদর্শন, ব্যবহার বড় ভালো। বেশির ভাগ আরমেনিয়ান। কিছু সিদিয়ান—তাদের চুল হলদে ; কিছু পার্সিয়ান—তাদের ভুরু কালো ; কিছু সিরিয়ান—কান্তিময় কমনীয় তাদের অঙ্গ। শুনলাম, পৃথিবী জুড়ে যখন প্রলয়তাণ্ডব চলছে, তখন তারা ঠাঁই নিয়েছে এখানে। এদের প্রাণে ভয়ডর নেই। সিংহ, চিতা আর তীক্ষ্ণ চক্ষু বুনো বেড়াল টহল দেয় রাস্তায়—ছায়ায় গা ঢেকে—তাই তাদের প্রথম-প্রথম দেখতে পাইনি।

সুন্দর মানুষরা সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছিল আমাদের। কেন এসেছি এখানে, তা খুলে বলেছিলাম। শ্বেতপর্বতের ছায়ায় থাকব—ভবিষ্যৎবাণী তাই। সেইসঙ্গে জানিয়ে দিলাম, ব্যাবিলন—সুলতানের লেফটেন্যান্ট আমাকে এই শহরের গভর্নর করে দিয়ে গেছেন।

ওরা ফুলের উপাচার দিয়ে বন্দনা-সঙ্গীত গেয়ে আমাদের বরণ করে নিয়েছিল।

[ক্রমশঃ]

লিওনার্দো দ্য ভিন্সির সায়েন্স ফ্যান্টাসি

ম হা প্লা ব ন

সম্পাদনা ঃ অদ্রীশ বর্ধন

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

এরপর নির্ভয়ে ঘুরতাম পথে-ঘাটে। বাঘ, সিংহদের ভয় পেতাম না। এ এমনই এক শহর যে-শহরে ভেড়ার সঙ্গে সিংহ পাশাপাশি শুয়ে ঘুমোতে পারে। এখানে হিংসা নেই। তাই রেহাই পেয়েছে অগ্নিগর্ভ মেঘের করাল খপ্পর থেকে।

লণ্ঠন জ্বালিয়ে ওরাই নিয়ে গেল আমাদের সবুজ পাথরের প্রাসাদে। সেখানকার মেঝেতে পাতা পারস্যদেশীয় গালিচা। মাথার ওপর ঝুলছে অজস্র ঝাড়-লণ্ঠন। দাসদাসীরা ঘরে ঘরে মোতায়েন সেবার জন্যে।

সেই রাতেই শহরে মান্যগণ্যদের ডেকে আলাপ জমিয়ে নিলাম। প্রথমেই জানতে চাইলাম, শহরের ইতিহাস। ক্যালিনড্রা নামটা এল কোত্থেকে।

গ্রীক শব্দ 'ক্যালোস' আর 'অ্যানার' মানে সুন্দর মানুষ। ক্যালিনড্রা নাম এসেছে এই দুটো শব্দ থেকে।

জিজ্ঞেস করলাম—"তোমরা কার উপাসনা করো ?"

শুনে তো ওরা হতবাক। তারপর বললে—"উপাসনা করা যায় না, এমন কিছু আছে কি জগতে ?"

ওদের কোনও ধর্মবিশ্বাস নেই, কোনও ধর্মীয় বিধান নেই। ওরা পুজো করে শুধু সূর্যকে। ওরা বিশ্বাস করে সমস্ত জিনিসই প্রাণময়—এমন কি পৃথিবী আর সমুদ্রও। আর, ওরা ঘৃণা করে মিথ্যাকে।

এবার অবাক হবার পালা ফাদারের—"সবই প্রাণময়? মাথার এই চুল ?"

বলে, টেনে ছিঁড়লেন মাথার একগাছি চুল—বাড়িয়ে ধরলেন।

"প্রাণময় তো বটেই," বলেছিল ওরা—"পাখির গায়ে পালক গজায়—বছরে বছরে পালটায়, জন্তুজানোয়ারের গায়ে লোম গজায়—পালটে নেয় প্রতি বছরে—বেড়াল আর সিংহদের দাড়ির কিছুটা ছাড়া। মাঠে ঘাস গজায় একই নিয়মে, গাছে গজায় পাতা—নতুন করে গড়ে নেয় এদের অনেকেই। প্রাণময় প্রত্যেকেই—অবশ্যই।"

"এই পৃথিবী ?" ঝুঁকে বসলেন ফাদার।

"পৃথিবীও প্রাণময়। প্রাণময় বলেই তার আত্মা আছে, আত্মা আছে বলেই তার শরীর ঘিরে কত কি জন্ম নিচ্ছে—বাড়ছে—নব কলেবরে পালটে নিচ্ছে নিজেদের। মাটি এই পৃথিবীর গায়ের মাংস, আর পাহাড়-পর্বত তার শরীরের কঙ্কাল, নরম বালি পাথর এই শরীরেরই তরুণাস্থি, ফোয়ারাগুলো দেহের রক্ত। পৃথিবীর হৃৎপিণ্ড ঘিরে থইথই করছে যে রক্তের সরোবর—তাদেরই বলছি মহাসাগর। শ্বাসপ্রশ্বাসে উঠছে নামছে জোয়ার আর ভাঁটা—বইছে সাগরের জল। পৃথিবীর সজীব শরীরের সবীজ উত্তাপ তো আগুন—যে আগুন ছড়িয়ে রয়েছে পৃথিবীর সব জায়গায়। সৃজনশীল আত্মার অধিষ্ঠান এই অগ্নির মধ্যে—প্রাণময় অগ্নি—প্রাণাগ্নি—এই প্রাণাগ্নি উৎসারিত হচ্ছে বহু উষ্ণ প্রস্রবণ, গন্ধকখনি আর আগ্নেয়গিরি থেকে—যেমন ঘটছে সিসিলি-র মাউন্ট এটনা আগ্নেয়গিরিতে—এরা সবই প্রাণের আগুন।"

"ঈশ্বর পুজো করো না ?" ফাদারের প্রশ্ন।

"করি।"

"কিভাবে ?"

তারা হাসল। বললে—"রোজ ভোরে একটামাত্র চুম্বন উড়িয়ে দিই সূর্যের দিকে—এছাড়া ঈশ্বরপুজো আর কোনওভাবে হয় কি ?"

নড়ে গেলেন ফাদার। খবরটা জানাবেন রোমের যাজকদের ? কিন্তু রোম আর আছে কি ?

বললেন—"সূর্য নিয়ে এত মাতামাতির কিছু আছে কি ? একটু আলো ছাড়া সূর্য আর দিচ্ছে কী ?"

এবার কিন্তু অবাক হলো জোয়ান পুরুষরা—"একটু আলো ! বলেন কি ? দিনে রাতে সূর্য স্নান করে চলেছি—বিরাম নেই সূর্যকিরণের—"

ধমক দিলেন ফাদার—"জ্যোতির্বিজ্ঞান একটু জানা দরকার তোমাদের। সূর্য কখনও রাতে আলো ঢালে না—সব্বাই তা জানে।"

ওরা শুধু জানলার দিকে আঙুল তুলে ধরল—তাদের জবাব।

রাত গাড়িয়ে মধ্যরাত পেরিয়ে গেছে কিন্তু অনেক উঁচুতে শ্বেত-পর্বতের ওপর দিকে ঝলমল করছে শুধু চাঁদের আলোয় নয়—সূর্যের আলোতেও।

বললে জোয়ানের দল—"খুবই উঁচু এই পাহাড়। সূর্যের আলো ওর গায়ে কোনও না কোনও সময়ে পড়বেই। সূর্যকে পুজো করি—মানুষকে করিনা—কারণ, এই বিশ্বে সূর্যের চাইতে বড় আর শক্তিমান কিছু নেই। বিশ্বের সমস্ত জ্যোতিষ্ক আলোকিত হয়ে রয়েছে সূর্যের আলোয়। প্রাণীদের বেঁচে থাকার ক্ষমতা আসছে সূর্যের কাছ থেকে। মানুষ যত পূজনীয়ই হোক না কেন, নক্ষত্র অথবা সূর্যের কাছে এক কণা ধুলোও নয়। এই পৃথিবীর মতন বিরাটও হয় যদি কোনও মানুষ—বিশ্বের আলোর সামনে সে নিতান্তই নগণ্য। আরও আছে ; সূর্যের মৃত্যু নেই—মানুষ কিন্তু নশ্বর। মানুষের ক্ষয় আছে, জরা আছে, ব্যাধি আছে—কবরে শুয়েও শরীর মিশে যেতে থাকে মাটির সঙ্গে ; সূর্যের এসব কিছুই নেই—তার কিছুই হয়না। সে ছিল, আছে, থাকবে।"

"এ তো দেখছি অদ্ভুত ব্রহ্মবিদ্যা, "বললেন ফাদার আমার দিকে চেয়ে—" খুঁটিতে বেঁধে পুড়িয়ে মারা উচিত এহেন ঈশ্বর অবিশ্বাসীদের।"

পাছে সন্ন্যাস-রোগ হয়ে যায় ফাদারের, এই ভয়ে ঘুরিয়ে দিলাম কথার মোড়। বললাম—"বিশ্বাসটা তোমাদের কিসে ?"

"পাঁচটা জিনিসে। এক, বিশ্বাস করি সূর্যকে। দুই, বিশ্বাস করি, সবই জীবন্ত। তিন, বিশ্বাস করি, কিছুই নিধন

করা উচিত নয়। চার, বিশ্বাস করি, মানুষের সৌন্দর্যে। পাঁচ, বিশ্বাস করি, মিথ্যার চেয়ে বড় অশুভ আর কিছু নেই—সত্যির চেয়ে উৎকৃষ্ট আর কিছু নেই।"

"অদ্ভুত ! অদ্ভুত !" বললেন ফাদার—"সত্যি আর মিথ্যে বলতে কি বোঝ ?"

"আলো যেমন অন্ধকার নাশ করে, সত্যি তেমনি মিথ্যের অবসান ঘটায়। সত্যি যে কোনও বস্তুর পঞ্চম অবস্থা বলে আমরা মনে করি—বিশ্বাস করি, ধীশক্তির একমাত্র আহার আর পুষ্টি এই সত্যি।

ফাদারকে এইভাবে বকে দিয়ে বিদায় নিল জোয়ান পুরুষরা।

কিন্তু ভয় পেলাম না ওদের কাউকেই। প্রত্যেকেরই ব্যবহার তো চমৎকার। এমনকি ওদের কথা শুনে ফাদার নিজেও চমৎকৃত। অগ্নিগর্ভ মেঘ নিশ্চয় এই কারণেই ক্যালিনড্রা শহরকে স্পর্শ করেনি। পারস্যবাসীদের মতন এরা পুজো করে আগুনকে—ক্রুশ সম্বন্ধে কোনও খবর রাখে না।

আনন্দময় দিনগুলো গড়িয়ে গেল একে একে—জানলাম ওদের অনেক অভ্যেসের বৃত্তান্ত। ফুলের মালা পরতে ভালবাসে, অঙ্গ বস্ত্রে ব্যবহার নিয়ে মাথা ঘামায় না, মধুর আচরণ করে, যার প্রত্যেকের সঙ্গে। অনেকের বাড়িতে দেখেছি, ঘোড়ার করোটি লাল রঙ মাখিয়ে স্তম্ভের ওপর রেখে দিয়েছে।

শহরে পা দেওয়ার এক সপ্তাহ পরে একটা ক্লান্ত সবুজ পায়রাকে ডানা ঝাপটাতে দেখা গেল সৈকতভূমিতে। এরকম পায়রা আরমেনিয়ায় দেখা যায় না। তাই নিয়ে আসা হলো আমাদের কাছে। দিওদার-এর চিঠি পেলাম তার পায়ে। দিওদার লিখেছেন ঃ

ক্যালনিড্রা-র গভর্নরকে আশীর্বাদ !

গঙ্গার পাড়ে অবস্থিত ব্যাবলিনের সুলতান আমাকে যে ক্ষমতা অর্পণ করেছেন, সেই ক্ষমতার বলে আপনাকে ক্যালিনড্রা শহরের গভর্নর পদে নিয়োগ করে এসেছিলাম—পৃথিবীব্যাপী প্রলয়ের মধ্যে থেকেও আপনারা জীবন নিয়ে আমার সান্নিধ্যে আসার পর। আরমেনিয়ার খবর জানান। সেইসঙ্গে জানান, টরাস পাহাড়ের শিখরের সংবাদ। সমুদ্রের জল যদি উঠতে থাকে, গোটা পৃথিবীকে গ্রাস করে—প্রাণে যারা বেঁচে যাবে, তারা যেন ওই চুড়োয় আশ্রয় নেয়।

চিঠি পড়েই বুঝলাম, খুব ভুল করেছি। পাহাড় জয় করার নির্দেশ দিয়েছিলেন দিওদার—খুবই স্পষ্ট গলায়। তাই ঠিক করলাম, আর দেরি না করে রওনা হওয়া যাক। ক্যালিনড্রা-র সবচেয়ে শক্তসমর্থ মানুষদের জড়ো করে ব্যক্ত করলাম আমাদের অভিপ্রায়। যুবকরা প্রথমে আপত্তি জানিয়েছিল। বলেছিল, এ-পাহাড় পবিত্র পাহাড়। চুড়োয় পা দিলে দেবতা রুষ্ট হবেন।

হেসে জবাব দিয়েছিলাম—"তোমরা তো দেবতা বিশ্বাস করো না। সূর্য ছাড়া পবিত্র আর কিছু আছে বলে মানো না। সুতরাং, যে পাহাড়ের চুড়ো দিবানিশি সমান আলোকময়—সেখানে পা দিলে মন তোমাদের আনন্দে ভরে উঠবেই।"

রাজী হয়ে গেল যুবকরা।

জগতে কিছু মানুষ আছে, আবিষ্কারের তাড়নায় তারা বুঁদ হয়ে থাকে। আবার কিছু মানুষ আছে যারা সূর্যের রহস্যময় উদ্দেশ্য ভেবে না পেয়ে গোলক-ধাঁধায় ঘুরে, মরে। আবার কিছু মানুষ আছে, যারা প্রত্যেকটা সবুজ বৃক্ষপত্রকে স্বর্গ অভিমুখী মোমবাতি বলে মনে করে। বেঁচে থাকার আনন্দ সব কিছুর মধ্যে খুঁজে পায়। এরাই পর্বতারোহণের অভিপ্রায় শুনে লাফিয়ে উঠল। এরা বুঝল, সব আবিষ্কারই পুজো আর প্রার্থনার সমান।

বেরিয়ে পড়লাম পর্বত আবিষ্কারে।

কিন্তু জানতাম না, এ পাহাড় কত উঁচু। শীত নিবারক পোশাক আর যথেষ্ট আহার্য নিলাম—সেইসঙ্গে নিলাম সেক্সট্যান্ট আর কোয়াড্রান্ট যন্ত্র—উচ্চতা নির্ণয়ের জন্যে দ্রাঘিমা আর অক্ষাংশ নির্ণয় করার জন্যে। নিলাম মোম মাখানো রেশমি তাঁবু, পরিখা খোঁড়বার যন্ত্র, আলো, কাঁচের চশমা নিলাম যাতে প্রখর দ্যুতিতে চোখ ধাঁধিয়ে না যায়—অন্ধ না হয়ে যাই। আর নিলাম, বেতের খাঁচায় সবুজ পায়রাদের।

প্রথমদিকে পাহাড়ে চড়তে বেগ পাইনি। পাইন, লরেল আর দেবদারু গাছের বনে পায়ে চলা পথ ছিল। অনেক নিচে দেখা যাচ্ছিল, সাদা আর সবুজ মার্বেল পাথরে তৈরি শহর। দেখা যাচ্ছিল, বন্দর আর নোঙর বাঁধা মাছধরা নৌকো। ভোরের আলোয় সে এক অপূর্ব দৃশ্য। সমুদ্রের দিক থেকে বয়ে আসছিল উষ্ণ বাতাস। অনেক উঁচুতে ঝকমক করছিল টরাস পর্বতের চুড়ো সকালের রোদে—গলার মালার মতন ঝুলছিল মেঘের দল। দেখে মনে হচ্ছিল, পৃথিবী থেকে যেন নিখাদ রুপোর ধারা উঠে যাচ্ছে আকাশ পানে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তুষার অঞ্চলে পা দিলাম, আরোহণ এবার কঠিন হয়ে দাঁড়ালো। তা সত্ত্বেও থামলাম না। রাত নামল। গর্জমান মেঘ শিখর ঘিরে থাকায় সূর্যালোকিত শিখরও দেখতে পেলাম না। চারিদিকে নিবিড় অন্ধকার। ক্ষীণভাবে দেখা যাচ্ছে বহু নিচের প্রাসাদ—পাহাড়ে প্রতিফলিত রুপোলি আলোয় যেটুকু দেখা যায়। বাতাসে ভাসছে ল্যাভেণ্ডার আর জুঁই ফুলের মিষ্টি সুবাস।

[ক্রমশঃ]

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ঘুমিয়ে পড়ল সবুজ কবুতরেরা। চাঁদ উঠল। তাকালাম সমুদ্রের দিকে—যদি দেখা যায় কোনও জাহাজ। কিন্তু কিছুই দেখলাম না। মিশরের দিক থেকে ভেসে এল না কোনও জাহাজ।

আরোহণ কিন্তু থামালাম না। চালিয়ে গেলাম মধ্যরাত পর্যন্ত। এইটুকু বুঝেছিলাম, দিওদার-এর আদেশ তামিল করতেই হবে। দেরি না করে। সাতদিন দেরি করার অনুতাপ দগ্ধ করছিল ভেতরটা। পর্বতশিখরের সংবাদ তিনি কেন চান, তা নিয়ে ভাবছিলাম না। মহাপ্লাবন আসছে, সত্যিই কি উনি বিশ্বাস করেন ?

শহর থেকে যে যুবকবৃন্দ এসেছিল সঙ্গে, তাদের মুখেই শুনলাম, পশ্চিমের মানুষদের বিশ্বাস, এ পাহাড়ের চুড়ো তৈরি হয়েছে একটা ধূমকেতু দিয়ে—পাথর আর তুষার দিয়ে নয়। খুব লম্বা আর লটপটে ল্যাজ আছে সেই ধূমকেতুর।

আমিও তা বিশ্বাস করেছিলাম। কেননা, মেঘের দঙ্গল একবারই ফাঁক হয়ে গেছিল। মনে হলো যেন দেখলাম একটা ধূমকেতু—দুলছে অনেক উঁচুতে মাথার ওপরে—টকটকে লাল আর সোনা রঙের।

দ্বিতীয় দিনে আরও মন্থর হয়ে এল পর্বতারোহণ—বাতাস এত পাতলা যে কষ্ট হচ্ছিল নিঃশ্বাস নিতে।

হিসেব করে দেখলাম, পাহাড়ের ঘাড়ে যেতে সময় লাগবে আরও তিন দিন—সেখান থেকে আরও দু'দিন লাগবে উচ্চতম শিখরে পৌঁছতে।

লাগুক সময়। হোক কষ্ট। পণ করলাম, শিখরে পা না দিয়ে নিচে নামব না।

ঝড় এল তার পরেই। মাথার ওপরকার জমাট মেঘ থেকে। লকলকে বিদ্যুৎ ঝলসে দিল মেঘের বাহিনীকে।

কিন্তু থামলাম না। ঝড় মাথায় নিয়ে উঠতে লাগলাম। দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখলাম একজনকে আর একজনের সঙ্গে। পায়রাদের পালকে তুষার পুরু হয়ে জমে যাচ্ছিল—ফুঁ দিয়ে তাদের গা গরম রাখছিলাম—যাতে বেঁচে থাকে।

আশ্চর্য এই যে, ঝড় সত্ত্বেও মেঘের ফাঁক দিয়ে মাঝেমাঝে দেখতে পাচ্ছিলাম পাহাড়ের চুড়ো। যেন জ্বলছে আগুনের আভায়।

যুবকদের জিজ্ঞেস করেছিলাম, এর আগে এ পাহাড়ে কেউ চড়ছে কিনা। আর কেউ উঠেছে কি ? চুড়োয় পৌঁছোনোর অন্য কোনও পথ আছে কি ?

না—তাদের সাফ জবাব।

তবে শুনেছে, সংসার ত্যাগী এক সন্ন্যাসী নাকি থাকেন পাহাড়ের ঘাড়ের কাছে—তুষারের মধ্যে। অবশ্য বেশ কয়েক বছর তাঁকে কেউ দেখেনি।

তাঁবু পাতলাম। সেই প্রথম অসন্তোষের চাপা গুঞ্জন শুনলাম।

চতুর্থ দিনের অপরাহ্নে যুবকবৃন্দের প্রতিনিধিরা এসে বললে, পাহাড়ে চড়ে লাভ নেই। বিপদও অনেক।

বাধা দিলাম না। ঠিক করলাম, পরে আসব—শিখর দর্শন করবই। খাবার শেষ হয়েছে, মেজাজও ঠিক রাখা যাচ্ছে না। তাই সখেদে ফিরে এলাম ক্যালিনড্রা-য়।

পরের দিন শহরের মাতব্বরদের ডেকে মিটিং করলাম। চিঠি লিখে দিলাম দিওদারকে।

ব্যাবিলন-সুলতানের লেফটেন্যান্ট
সোরিয়া অধিপতি দিওদার-কে
প্রথম চিঠি

আর্মেনিয়ার সীমান্তে এসে আপনার আদেশ পালন করে চলেছি। প্রথমে এই শহরের খোঁজ-খবর নিয়েছি।

সমুদ্রতীরের এই শহর রয়েছে টরাস পর্বতমালার সানুদেশে। পশ্চিমে রয়েছে মাউন্ট টরাস-এর সুউচ্চ শিখর। এত উঁচু যে মনে হয়, আকাশ ছুঁয়ে রসেছে। গোটা পৃথিবীতে এত উঁচু পর্বতশিখর আর নেই। সূর্যোদয়ের চার ঘন্টা আগে পুব দিকের সূর্য-কিরণ এসে পড়ে শিখরে। শুভ্রতম পাথর দিয়ে গড়া এই শিখর। ফলে, রাত শেষের দিকে চাঁদের কাজ করে যায় সূর্যকিরণের প্রতিফলন ঘটিয়ে। মেঘমন্ডল ঘিরে রয়েছে শিখর। মেঘের সবচেয়ে ওপরের স্তর থেকে আরও চার মাইল ওপরে রয়েছে পর্বতের চুড়ো।

সূর্য অস্ত যাওয়ার পরেও, রাতের তৃতীয় প্রহরে, পশ্চিম অঞ্চলের বিস্তীর্ণ অঞ্চল থেকে চুড়ো দেখা যায় স্পষ্টভাবে। এই কারণে, এখানকার লোকেরা মনে করে চুড়োয় রয়েছে একটা ধূমকেতু। অন্ধকারে নানারূপ পরিগ্রহ করে, দুটো অথবা তিনটি অংশ ভেঙে যায়, কখনও লম্বাটে হয়ে যায়, কখনও খুব ছোট্ট হয়ে যায়। এটা ঘটে দিগন্তের মেঘ, পাহাড় আর সূর্যের মাঝখানে এসে যায় বলে, সূর্য কিরণ ভেঙে ভেঙে যায়—পাহাড় থেকে ঠিকরে আসা আলোও ভেঙে ভেঙে যায় মেঘ রাশির মধ্যে দিয়ে আসবার সময়ে। এসব সমস্যা নিয়ে ভবিষ্যতে ভাবা যাবে।

আপনি যে গুরুদায়িত্ব আমাকে দিয়েছেন, তা সমাপন করতে গেলে যে পরিস্থিতি আর পরিবেশের মধ্যে দিয়ে আমাকে যেতে হবে, তার বর্ণনা আপনাকে দেওয়া দরকার বলেই এত কথা লিখলাম।

এশিয়া মাইনর, সমুদ্র আর সংলগ্ন ভূ-পৃষ্ঠের বর্ণনা বাদ দিলাম। আপনি তা জানেন।

মাউন্ট টরাস-এর আসল প্রকৃতি নিয়ে কথা বলা যাক।

প্রথমেই বলি, এই পাহাড় ককেসাস পর্বতমালার একটা বাহু। ক্যাসপিয়ান উপকূলের বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। তাঁরা জানিয়েছেন, দুটো পর্বতমালার নাম এক—কিন্তু আকৃতিতে একেবারে আলাদা—সবচেয়ে উঁচু চুড়ো রয়েছে এদিকে। আসল

মাউন্ট টরাস এইটাই। প্রাচ্যে অথবা প্রতীচ্যে এত উঁচু শিখর আর কোথাও নেই। তাই সূর্যোদয়ের চার ঘন্টা আগে থেকে সূর্য-কিরণ এসে পড়ে শিখর দেশে।

পাহাড়ের ওপর দিকে হাওয়ার বেগ এত বেশি যে, পাথরের চাঁই খসে খসে পড়ে। তা সত্ত্বেও পাহাড়ে চড়ার চেষ্টা করেছিলাম। তিনমাইল উঠে পেয়েছিলাম জঙ্গল। আরও তিন মাইল উঠে মাঠ আর তৃণভূমি, তারপর থেকেই টরাস-এর শিখর পর্যন্ত শুধুই তুষার—যা থাকে বারোমাস। চোদ্দমাইল জুড়ে বিরাজ করছে এই তুষার, শুনলাম, মাঝামাঝি উঠলে উষ্ণ বাতাস পাওয়া যাবে—কিন্তু নিঃশ্বাস নেওয়ার বাতাস নেই এখানে—কিছুই বাঁচতে পারেনা সেই কারণে।

এত বিপদ মাথায় নিয়েও আমরা পাহাড়ে চড়েছিলাম। কিন্তু দামাল হাওয়া আর নিদারুণ শৈত্যের জন্যে পর্বতারোহণ চালিয়ে যেতে পারিনি। স্থানীয় আরমেনিয়ানরা জানিয়েছেন, দেবতা বাধা দিয়েছেন, পর্বত শিখর অপবিত্র করতে চান না বলে।

আপনার আশীর্বাদ আর পুনরাগমনের প্রতীক্ষায় রইলাম।

চিঠি নিয়ে সৈকতভূমিতে এসে সবুজ পায়রার পায়ে বেঁধে উড়িয়ে দিলাম।

শান্ত সমুদ্রের দিকে চেয়ে ভেবেছিলাম, এমন জল কক্ষনো মাতাল হয়ে ঠেলে উঠতে পারেনা—মহাপ্লাবন সম্ভব নয়।

সাতদিন পরে সবুজ পায়রা উড়ে এল দিওদার-এর চিঠি নিয়ে ঃ

ক্যালিনড্রা গভর্নরকে আশীর্বাদ !

দু'বার বললাম পাহাড় চুড়োয় যেতে—আদেশ অমান্য করলে। কেন, বুঝতে পারছিনা।

দিওদার রেগেছেন। সেইদিনই শহরের সবাইকে ডেকে পাঠালাম। মূল বিষয় নিয়ে কথা বলবার আগেই একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটল।

শহরের প্রায় সকলেই হাজির হয়েছিল বাজার চত্বরে। আকাশ ছিল সুনীল, মেঘের চেকনাই ছিল দিগন্তে। লাল পাল তুলে মাছ ধরার নৌকোগুলো পাড়ি জমিয়েছিল গভীর সমুদ্রে।

এরকম শান্তিপূর্ণ অবস্থায় এ-শহরকে আগে কখনও দেখিনি। যে গ্রাম থেকে এসেছি, সে গ্রামের মতন আঙুরের খেত এখানে নেই বটে, কিন্তু রয়েছে সুউচ্চ শুভ্র পর্বত।

আচমকা মুখোশধারী এক আগন্তুকের আবির্ভাব ঘটল বাজার চত্বরে—দু'হাত মাথার ওপর তুলে এগিয়ে এল আমার দিকে। গলার শির তুলে আকাশ কাঁপানো চিৎকার ছেড়ে বললে—"নিপাত যাক চোরদের সরকার ! পাহাড়ে চড়াতে চায় কেন ? ঠাণ্ডায় আর অনাহারে তোমাদের খতম করবে বলে ! লুঠ করতে চায় তোমাদের সম্পদ ! নিপাত যাক এই চোর !"

গর্জে উঠলেন ফাদার—"খোলো মুখোশ !"

সমান হুঙ্কার ছেড়ে বললে আগন্তুক—"আমার মুখোশহীন মুখ যে দেখবে, তার কপালে আছে শোচনীয় মৃত্যু !"

মাথার ওপর ক্রুশ তুলে ধরলেন ফাদার। আগন্তুক টলে গেল না। বরং অট্টহেসে বললে—"ওসব বুজরুকিতে আমার কিস্‌সু হবে না।"

মঞ্চ থেকে নেমে সোজা তার দিকে হেঁটে গেলেন ফাদার।

বললেন—"গলা শুনেই চিনেছি। তুমি কাউন্ট লোরেনজো। এসেছো আমাদের পেছন পেছন। কিন্তু এলে কিভাবে ?"

পৈশাচিক অট্টহাসি থেমে একটানে মুখোশ খুলে ফেলল আগন্তুক।

ভয়ে লোক পালালো দূরে। ফাদার কিন্তু পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন তার সামনে।

কাউন্ট লোরেনজো-ই বটে। বুক কেঁপে উঠল আমার। প্রচণ্ড ক্রোধে যেন অগ্নিবর্ষণ করছে তার দুই চক্ষু।

বললে কর্কশ গলায়—"আমিই সেই ভবিষ্যৎ বক্তা। মানুষের মঙ্গলের জন্যেই এসেছি ধরায়। নরকের শক্তি রয়েছে আমার মুঠোয়। ভবিষ্যতের ফটক খুলে ধরতে পারি শুধু আমি। করতে পারি না, এমন কিছুই নেই।"

বজ্র-হুঙ্কারে বললেন ফাদার—"তুমি ডাইনিবিদ্যের উপাসক। বিদেয় হও—শয়তান কোথাকার !"

এই কথার সঙ্গে সঙ্গে ঘটে গেল অসাধারণ সেই পরিবর্তন।

দুই পাছায় দুই হাত রেখে উদ্ধত ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়েছিল যুবক রাজপুত্র। এখন আচমকা পোশাক খসে পড়ে গেল মাটিতে। এতো ভয়ানক দর্শন এক জন্তু। মুখখানাই শুধু কাউন্টের। কিন্তু সারা গায়ে মাছের আঁশ। মিশকালো ভুরুর নিচে রক্তরাঙা চক্ষুযুগলের দিকে চেয়ে থাকাও যাচ্ছেনা।

বাজার ফাঁকা হয়ে গেল চক্ষের নিমেষে। শয়তানের চেহারাও বুঝি এই করাল কদাকার আকৃতির তুলনায় অনেক সুন্দর। এতো দেখছি সব শয়তানের সম্রাট—শয়তান স্বয়ং যাকে দেখলে শিউরে উঠবে।

[ক্রমশঃ]

লিওনার্দো দ্য ভিন্সির সায়েন্স ফ্যান্টাসি

ম হা প্লা ব ন

সম্পাদনা ঃ অদ্রীশ বর্ধন

সপ্তম পরিচ্ছেদ

লোকজন প্রথম দিকে চম্পট দিয়েছিল বটে, তারপর দূর থেকে যখন দেখল, আগন্তুক সাইজে তাদের সমান—এসেছে তাদেরকেই ধ্বংস করতে—তখন সাহসে বুক বেঁধে রুখে দাঁড়ালো দূরে দূরে। সঙ্গে নিয়ে এল চিতা আর বাঘ। তারপরেই মার মার করে তেড়ে এল বীভৎস প্রাণীটার দিকে।

ভেবেছিলাম, মারমুখো এই জনতা কুৎসিত করাল এই পিশাচকে পায়ে মাড়িয়েই খতম করে দেবে। ভাবনাটা হয়েছিল ভুল।

আচম্বিতে শূন্যে ঠিকরে গেল বিকটদেহী কাউন্ট। মানুষের সাইজে সে আর এক আতঙ্ক। রোদ্দুর-ঝলমলে চত্বরের মাথায় সে এখন উড়ছে। দু'বাহু থেকে বেরিয়ে এল যেন ঈগল পাখির ডানা। পিঠ ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে আগুনের হল্‌কা। যেখানে ফুলকি পড়ছে, সেখানেই বিস্ফোরণ ঘটছে—আগুন লাগছে।

আতঙ্কে অবশ হয়ে আমি চেয়ে রইলাম অবিশ্বাস্য সেই আকৃতির দিকে।

সবচেয়ে ডাকাবুকো যারা, তারাও এই দৃশ্য দেখে ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে উঠে পালাচ্ছে।

সেই সন্ধ্যাতেই সব লিখে জানালাম দিওদারকে ঃ

ব্যাবিলন-সুলতানের লেফটেন্যান্ট
সিরিয়া-অধিপতি দিওদার-কে
দ্বিতীয় চিঠি

ভয়ানক কাণ্ড ঘটে গেল এখানে। আশ্চর্য এক মানুষের আবির্ভাব ঘটেছিল। আপনার চিঠি পেয়ে যখন শহরের সবাইকে জড়ো করে পাহাড়ে চড়ার কথা শুরু করতে যাচ্ছি, ঠিক সেই সময়ে তেড়ে এল এক মুখোশধারী আগন্তুক। সে চায় না আমরা পাহাড়ে উঠি। সে নাকি নরকের ক্ষমতা হাতের মুঠোয় এনেছে। সে মানুষেরি মঙ্গল করতেই এসেছে এই পৃথিবীতে—ধ্বংস করার ক্ষমতাও তার আছে। ফাদার তার গলা শুনেই চিনতে পেরেছিলেন। তার নাম কাউন্ট লোরেনজো। যে গ্রাম থেকে আমরা এসেছি, সেই গ্রামের জমিদার। ডাইনিবিদ্যের সাধক। লাল মেঘের আবির্ভাব যখন ঘটেছিল, তখন তাকে দুর্গ-প্রাকারে দেখেছিলাম। ভবিষ্যৎ বক্তার ছদ্মবেশে সে মানুষকে সাবধান করেছে। তারপরেই যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছিল। ডাইনিবিদ্যে নাকি অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে। আজ যা ম্যাজিক—কাল তা সত্যি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কাউন্ট লোরেনজো হয়তো এই বিদ্যেকেই যন্ত্র-ক্ষমতার মধ্যে দিয়ে এমন পর্যায়ে নিয়ে গেছে, যার ফলে সে প্রকৃতির শক্তি নিয়ন্ত্রণ করছে—প্রকৃতিকে ভয়াল ভয়ঙ্কর করে তুলছে লাল মেঘের মারণাস্ত্র দিয়ে। আমার বিশ্বাস, লাল মেঘ তারই সৃষ্টি—সব যুদ্ধের যা নিয়ম, সে তাই চাইছে। আগে হোক সব ধ্বংস—তারপর উড়ুক বিজয়কেতন।

এই গুপ্তবিদ্যায় সে অভাবনীয় শক্তি অর্জন করেছে। কোনও মানুষের পক্ষে এ-হেন ক্ষমতা প্রদর্শন অসম্ভব বলেই জানতাম। কিন্তু আমাদের চোখের সামনেই সে যখন আচমকা দুঃস্বপ্নসম বিকট পশুদেহ ধারণ করল এবং আকাশে উড়ে গিয়ে আগুন বৃষ্টি করে বিস্ফোরণের পর বিস্ফোরণ ঘটাতে লাগল—তখন আমাদের আর কিছু করার ছিল না। রোদ্দুর ঠিকরে যাচ্ছিল তার আঁশ ঢাকা গা থেকে—আগুন বেরচ্ছিল পিঠফুঁড়ে। তারপরেই বিকট হেসে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে দিয়ে মিলিয়ে গেল মেঘলোকে।

কিন্তু সে আবার আসবে। এবার নিশ্চয় লাল মেঘ নিয়ে আসবে। এই শহরে সে এতদিন উৎপাত করেনি—এবার সে যা করে গেছে, তার ফলে এখানে

হাহাকার ছাড়া কিছু শোনা যাচ্ছে না। তার অকস্মাৎ আঁশময় শরীর ধারণ, তার নিমেষে মেঘের কোলে উল্কাবেগে মিলিয়ে যাওয়া—সবই নিশ্চয় কোনও গুপ্তবিদ্যের শক্তিতে করে গেছে—মানুষ হয়েও এই অসাধারণ ম্যাজিকের মতন কাণ্ড যে ঘটাতে পারে, তার খপ্পর থেকে বাঁচাতে পারেন শুধু আপনি। আসুন, এই চিঠি পেয়েই, বেগুনি পাল উড়িয়ে জাহাজ নিয়ে চলে আসুন। আমরা বড় অসহায়।"

চিঠি বেঁধে দিলাম সবুজ পায়রার পায়ে—উড়িয়ে দিলাম আকাশে।

খুব ক্ষতি হয়ে গেছিল অমানুষিক সেই কাণ্ডর পর। হতাহত হয়েছিল অনেক মানুষ—বহু বাড়িও আস্ত থাকেনি। সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছিল বাজার চত্বরের।

কিন্তু আর্মেনিয়ানরা হা-হুতাশ করে সময় কাটাবার পাত্র নয়। সঙ্গে সঙ্গে লেগে গেছিল শহর মেরামতির কাজে। আহতদের শুশ্রূষা চলছিল জোর কদমে।

একটা হেঁয়ালি ভাবিয়ে তুলেছিল আমাকে। মানুষ হয়ে গেল অপার্থিব পশু—এসবই তো শয়তানের কারসাজি। কাউন্ট লোরেনজো এমনকি গুপ্তবিদ্যা আয়ত্ত করেছে, যার শক্তি দিয়ে এমন অসম্ভব কাণ্ড করা যায় ?

প্রকৃতির চাইতে শক্তিধর আর কিছু নেই এই বিশ্বে। প্রকৃতি গড়ছে, প্রকৃতি ভাঙছে। সেই সৃজনীশক্তি আর সংহারশক্তি আয়ত্ত করেছে কাউন্ট লোরেনজো—সেই শক্তিরই রুদ্ররূপ কিছুটা দেখিয়ে গেল বাজার-চত্বরে। সুদূর উত্তর ইটালি থেকে এখানে তার চলে আসাটাও তো রহস্যময়।

কিন্তু মহাপ্লাবন কি আদৌ সম্ভব ?

আমারতো মনে হয়নি।

তা সত্ত্বেও পাহাড়ে অভিযানের তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছিলাম। কিন্তু বিদেশ যাত্রায় শত চেষ্টা করলেও বিলম্ব ঘটেই। আমাদের দেরি হওয়ার ন্যায্য কারণও ছিল। আহতদের শুশ্রূষার ব্যবস্থা করতে হচ্ছিল। ভাঙা শহর মেরামত করতে হচ্ছিল। বাঘ, সিংহ, চিতারা
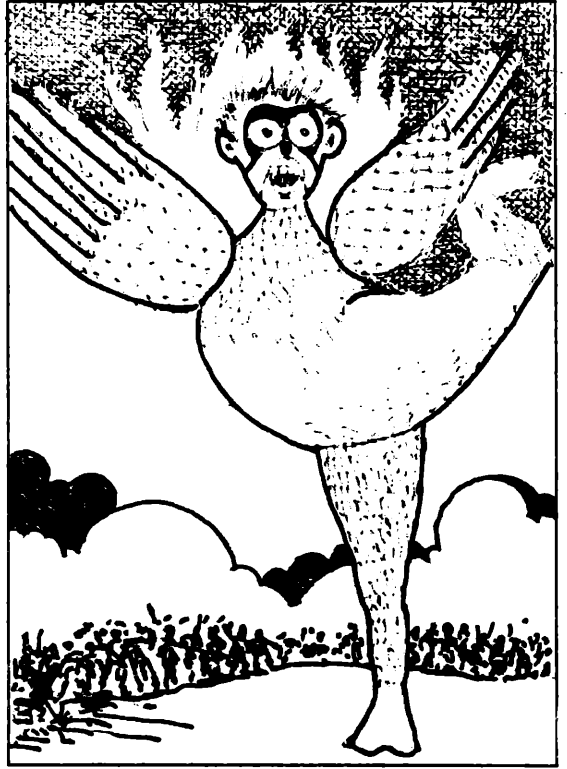
অকস্মাৎ মানুষের রক্তের স্বাদ পেয়ে হিংস্র হয়ে উঠেছিল, তাদের শায়েস্তা করতে হচ্ছিল।

ঠিক এই সময়ে এল দিওদার-এর বার্তা ঃ

হুকুম দিয়েছিলাম—অমান্য করার জন্যে নয়।

'মহাপ্লাবন' আসছে—এই গুজব ডালপালা মেলে ছড়িয়ে পড়ল তখন থেকেই। গুজবের সূত্রপাত প্রথম কে করেছিল, তা জানতে পারিনি। ছদ্মবেশী কাউন্ট লোরেনজোকে শহরে আর দেখা যায়নি। আমি চর মোতায়েন করেছিলাম—নবাগত কেউ শহরে এলেই যেন তার নাড়িনক্ষত্র জানা হয়। কিন্তু গুপ্তচরেরা কোনও খবর আনতে পারেনি।

তা সত্ত্বেও যেন হওয়ায় খবর ছড়িয়ে গেল, আসছে...আসছে মহাপ্লাবন।

সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে প্রশান্ত সমুদ্র দেখতাম আর ভাবতাম—কক্ষনো না—এমন ধীর স্থির জল কক্ষনো উদ্দাম উত্তাল হয়ে জনপদ ভাসিয়ে দিতে পারে না।

কানাকানি কিন্তু একটু একটু করে বেড়েই গেছে।

মহাপ্লাবন আসছে—এই আতঙ্ক সকলের অন্তরেই সঞ্চারিত হয়ে গেছিল।

আমার সংশয় কিন্তু যায়নি। সত্যিই কি সেকালে একবার মহাপ্লাবন হয়েছিল ? নোয়া-র আমলে প্লাবন দেখা দিয়েছিল ঠিকই—কিন্তু সেই প্লাবন পৃথিবীব্যাপী প্লাবন কিনা, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে বিলক্ষণ। বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে, সেই প্লাবন স্থায়ী হয়েছিল চল্লিশ দিন আর চল্লিশ রাত। জল উঠে গেছিল পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ের একশ হাত ওপরে অর্থাৎ দেড়শ ফুট ওপরে।

তাই যদি হয়, প্রশ্ন করেছিলাম নিজেকেই, জল যদি এত ওপরেই ওঠে, তাহলে প্লাবনের অন্তে সে জল গেল কোথায় ? প্লাবন শেষ হলো কিভাবে? জল সদা নিম্নমুখী—ওপরে উঠে গিয়ে অবশ্যই গোলক আকারে ডুবিয়ে রেখেছিল পৃথিবীকে। জল সবসময়ে গড়িয়ে নামে পাহাড় থেকে। অত উঁচু জল গড়িয়ে নেমে গেল কোথায় ?

এই গেল আমার মৌলিক চিন্তা। গুজব কিন্তু রোখা গেল না। পাহাড়ের দিকে চাইতাম আর ভাবতাম—শেষ পর্যন্ত পাহাড়ে চড়তে পারবে তো ?

এই ভাবেই গেল পনেরোটা দিন।

তারপরেই হন্তদন্ত হয়ে এল আমার পুত্র। উত্তেজনায় মুখ লাল। বললে—"সব প্রস্তুত। রওনা হবো এখুনি।"

"কোথায় ?"

"পাহাড়ে। মেয়ে, বাচ্চা, বুড়োরা মাছ ধরার নৌকোয় থাকবে।"

খুশি হলাম। এত তাড়াতাড়ি বন্দোবস্ত হয়ে যাবে, ভাবতে পারিনি।

চেয়েছিলাম কিন্তু সমুদ্রের দিকেই। যে কোনও কারণেই হোক, আমার মনে হচ্ছিল, জল ঠেলে উঠবে আচমকা।

কিন্তু ভয়ঙ্কর বিপর্যয়টা সেভাবে ঘটেনি। ঘটল একেবারে অন্যভাবে।

সমুদ্র শান্ত। গাংচিল পাক খাচ্ছে জলের ওপর। রোদে ঝলমল করছে মাছ ধরা নৌকো। বাজার-চত্বর থেকে ভেসে আসছে কোলাহল।

আচম্বিতে একটা শব্দ শোনা গেল। যেন, হাওয়ায় গাছের ডাল ভেঙে পড়ছে। সেইসঙ্গে, কড়-কড়-কড়াৎ শব্দে যেন বাজ পড়ল।

বাজার-চত্বর ফেটে গিয়ে দু'পাশে সরে গেল—ফাটল দিয়ে ঠিকরে এল দাউ দাউ আগুনের লকলকে অগ্নিশিখা—গাঢ় লাল আর নীল রঙে শিখা—এত উঁচুতে উঠে গেল নিমেষ মধ্যে, যে শিখার প্রতিফলন দেখা গেল শান্ত সবুজ সমুদ্রের জলে।

পায়রার খাঁচা হাতে ঝুলিয়ে টেনে দৌড়োলাম পাহাড়ের দিকে। যেন পাগল হয়ে গেলাম। পেছনে দেখলাম, আরও আগুন মাটি ফাটিয়ে লকলকিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে আকাশের দিকে। সেইসঙ্গে শোনা যাচ্ছে গুরুগম্ভীর নিনাদ—আসছে সমুদ্রের দিক থেকে—স্থলের রোষবহ্নির তালে তাল মিলিয়ে সমুদ্র যেন রোষে ফেটে পড়তে চাইছে। ডাঙার আগুন খেপিয়ে দিয়েছে জলধিকে।

আগুনের শিখা তো একটা নয়—কয়েকশ'। এতই লেলিহান আর বিপুল উত্তাপে ঠাসা যে, সেই দীপ্তির প্রতিফলন ঘটছে অনেক উঁচুর পর্বত-তুষারে।

দম ফুরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে দৌড়েই গেলাম—একবারও থামলাম না। আতঙ্ক তাড়িয়ে নিয়ে গেছিল আমাদের। সে যে কি আতঙ্ক, জন্মে-ইস্তক কখনও উপলব্ধি করিনি।

তুষার-অঞ্চলে পৌঁছে নেতিয়ে পড়লেন ফাদার।

অনেক বোঝালাম। আর যেতে চাইলেন না। শান্ত নীল চোখে চেয়ে রইলেন নিচের মহাকায় আগুন শিখাদের গগনস্পর্শী মাতামাতির দিকে—লাল আভার প্রতিফলন দেখলাম নীল চোখে। কিন্তু অবিচল রইলেন সঙ্কল্পে। আর উঠবেন না। পরমপিতার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করে যাবেন ওইখানেই।

আমরা দৌড়োলাম। ওঁকে ফেলে। পোড়া কাঠ আর স্ফুলিঙ্গ উড়ে গেল। পাশ দিয়ে। বেড়ে গেল অপার্থিব গুরু-গুরু গজরানি। জ্বলন্ত গাছের ডাল আছড়ে আছড়ে পড়তে লাগল সামনের পথে।

দুই মেয়ে কিন্তু একদম ভয় পায়নি। বাঘ আর বুনো জন্তুর সামনে ছোটরা ভয় পায় না—তাদের সাহসকে সমীহ করে বাঘ আর বুনো জন্তু ক্ষতি করেনা।

সেদিনও আছড়ে পড়া জ্বলন্ত ডাল, আধপোড়া বনের পশু ওদের কোনও ক্ষতি করেনি।

[ক্রমশঃ]

অষ্টম পরিচ্ছেদ

তারপর আগুনের আঁচে গলতে লাগল তুষার।

নিচে তাকিয়ে দেখলাম। গোটা ক্যালিনড্রা শহর আগুনের আঁচে লাল হয়ে গেছে। সমুদ্র রুষ্ট হয়েছে। আকাশ থেকে লকলকে বিদ্যুৎশিখা নামছে। বাড়ি প্রাসাদ, স্তম্ভ ঠিকরে যাচ্ছে। সবচেয়ে ভয়ানক ভূ-পৃষ্ঠের লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে ফেটে চৌচির হয়ে যাওয়া, সেইসঙ্গে আকাশও যেন বিদীর্ণ হয়ে ঢেলে যাচ্ছে বিদ্যুতের আগুন।

সেইদৃশ্য এমনই বিস্ময়কর যে, আমরা থ হয়ে দাঁড়িয়ে গেছিলাম—চোখ ফেরাতে পারিনি। ঠায় দেখে গেছি ঘন ঘন বিদ্যুৎশিখা আঘাত হানছে শহরকে, বাজ পড়ছে বিরামবিহীনভাবে। বাতাস ভারি আর কটু হয়ে গেছে গন্ধকের গন্ধে—বিপর্যয় যাকে ছড়িয়ে দিয়েছে বাতাসে।

মেয়েদের বললাম—"আর নয়। ওঠা যাক। গোটা পাহাড়ের তলার দিক এখুনি গরমে গলে যাবে। আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলবে জ্বলন্ত সরোবরে, হাজার হাজার আগুনের শিখার মধ্যে।"

মেয়েরা হাঁপিয়ে গেছিল, কিন্তু ভয় পায়নি। ভয় পায়নি পায়রারাও। বকম বকম করে ভালবাসার গান গেয়ে যাচ্ছিল। আগুনের লাল আভায় প্রদীপ্ত নীল পাখিদের আরও সুন্দর লাগছিল।

আকাশের সূর্য আর চাঁদও ঢাকা পড়ে গেছিল গগন ছোঁয়া আগুনের শিখায়। নক্ষত্র পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল না। রক্ত-জল-করা এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যেও ভাবতেও ভাল লাগছিল—পাহাড়ের আরও ওপরে উঠতে পারলে আশ্রয় নিশ্চয় পাব—তুষারশুভ্র ওই চুড়ো নিশ্চয় আগলে রাখবে আমাদের।

এই আশা-ই মনে আর শরীরে বল জুগিয়ে গেছিল। যে জায়গায় পায়ের ছাপ ফেলে উঠেছি, দেখতে দেখতে সেই জায়গার তুষার গলে গিয়ে পদচিহ্ন ভরাট করে দিয়েছে। আগুনের শিখা তেড়ে আসছে পেছনে।

আতঙ্ক মূর্তিমান হয়ে আমাদের ধাওয়া করেছিল বলে একটা সেকেণ্ড-ও নষ্ট করতে পারিনি। পাহাড়ের গা চাটতে চাটতে আগুনের শিখা উঠে এসে আমাদের ধরে ফেলতে চায়—দম নেওয়ার ফুরসৎও পাইনি। বরফ গলে গলে সোনালি নদীর আকারে পাহাড় বেয়ে নেমে যাচ্ছে—আমরা বড় বড় পাথরের আড়ালে গা বাঁচিয়ে উঠছি-তো-উঠছিই। আগুনের আঁচ এতই প্রচণ্ড যে, দীপ্তিতে চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছিল—অন্ধ মনে হচ্ছিল মাঝে মাঝে—ফ্যালফ্যাল করে শুধু তাকিয়েই ছিলাম। হোঁচট খেয়ে পড়ে গেছি, উঠতেও ভুলে গেছি—বোবা বিস্ময়ে পায়ের তলায় জ্বলন্ত অরণ্যের আর্তনাদ শুনে গেছি।

একবার পেছন ফিরে একসঙ্গে অনেকগুলো দৃশ্য দেখেছিলাম। গুনে রাখতে পারিনি। চোখের পটে সেইসব দৃশ্য স্থায়ী ছাপ ফেলে গেছে। দেখেছিলাম, গাঢ় তমালকালো তমিস্রা বিপুল বেগে ধেয়ে আসছে ; শুনেছিলাম, বাতাস উন্মাদ আক্রোশে গর্জে যাচ্ছে—দেখেছিলাম, তাদের রুদ্রনৃত্য কি অবিশ্বাস্য বিভীষিকা রচনা করে চলেছে ; দেখেছিলাম, বনস্পতিময় বনানী দাউদাউ করে জ্বলছে ; দেখেছিলাম, আকাশ ফাটিয়ে জলপ্রপাতের মতন বৃষ্টি ঝরছে—সেই জলধারার বুক চিরে এঁকে বেঁকে নেমে আসছে ঘোর করালরূপী কালান্তক অশনি ; দেখেছিলাম, ভূমিকম্প, বিধ্বংসী কম্পনে কঠিন পর্বতের চুরমার হয়ে যাওয়া আর মাটির সঙ্গে শহরের মিশে যাওয়া ; দেখেছিলাম, ঘূর্ণি বাতাস আর উত্তুঙ্গ ফেনা উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে মানুষ আর গাছের ডালকে বাতাসের মধ্যে দিয়ে ; সেইসব গাছের ডাল জড়িয়ে ঝুলছে মানুষ ; দেখেছিলাম, অসংখ্য মাছধরা নৌকো আছড়ে আছড়ে পড়ছে পাথরে—ভেঙে খানখান হয়ে যাচ্ছে।

শিলাবৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড় আর বজ্রপাত। পালাচ্ছে গরু, মোষ, ভেড়া, ঘোড়া।

এইসব দৃশ্যের মধ্যে জঘন্যতম দৃশ্য, বাতাসে উড়ে যাওয়া গাছের ডাল জাপটে ঝুলে থাকা মানুষদের দৃশ্য।

বাড়ি, পাথর, মিনার, পাহাড়—মানুষ থুক থুক করছে সব জায়গায়। যে সব জিনিস মাটি আঁকড়ে থাকে না—সে সব জিনিসই হু-হু করে ভেসে যাচ্ছে জলের ওপর দিয়ে—নৌকো, টেবিল, বারকোস, পিপে। মানুষ আর পশু পিলপিল করছে পাহাড়ে—নীল বিদ্যুৎ সর্বশক্তি নিয়ে আছড়ে পড়ে পুড়িয়ে মারছে তাদের।

আমার ঘোর কেটে গেছিল মেয়েদের টানাটানিতে—"দেখো না—এ দৃশ্য দেখা যায় না !"

আগুন ঢালছে পৃথিবীর জঠর। কিছুই করবার নেই আমাদের। হলুদ থামের আকারে উঠছে ধোঁয়া। নিকষকালো মেঘ ঢেকে দিয়েছে পর্বতশিখর—চুড়ো আর দেখতে পাচ্ছি না।

ধেয়ে গেলাম দৃষ্টির আড়ালে থাকা সেই চুড়োর দিকে। অনেক পেছনে একই চেষ্টা চালিয়ে জ্বলন্ত দেহী পশুরা—আগুন ধরে গেছে তাদের পশুলোমে। লাফিয়ে উঠতে গিয়ে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে অনেক নিচের পাথরে। জ্বলছে মানুষেরাও—আগুন লেগে গেছে তাদের মাথার চুলে।

দায়ী কে ? কে দায়ী এই বিভীষিকার জন্যে ? ডাইনিবিদ্যে যে করায়ত্ত করেছে—সে ? এই মহাপ্রলয় কি মানুষের হাতে গড়া ?

জবাব জানতেই হবে—পরে। ইতিমধ্যে পুড়তে পুড়তে মরছে পশুরা—আকাশবাতাস ফালাফালা হয়ে যাচ্ছে তাদের মরণ-আর্তনাদে। ধ্বংস হয়ে গেছে অরণ্য। পায়ের নিচে ফেটে-ফুটে মুখব্যাদান করছে পাহাড়ের গা। ভেতর থেকে গড়িয়ে নামছে টগবগে ফুটন্ত লাভা।

অভিশাপ দিয়েছিলাম সেই মুহূর্তে। অভিশাপ দিয়েছিলাম সেই বুদ্ধিমূর্খ ডাইনিবিদ্যের পণ্ডিতকে, গুপ্তরহস্য আয়ত্ত করে যে লোকটা গোটা পৃথিবীকে বহ্নিশিখায় পুড়িয়ে প্রাণশূন্য করে দিচ্ছে। পৃথিবীর কোনও আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সঙ্গে তুলনীয় নয় সেই দৃশ্য। আমার ভাষা নেই সেই দৃশ্যকে ফুটিয়ে তোলার। শুধু বলব, রক্তাক্ত অগ্নিধারায় প্লাবিত হয়ে গেছিল ধরিত্রী, ফুঁসছিল আর গর্জাচ্ছিল সমুদ্র, আর মানুষের কাতরানিতে আকাশবাতাস ছেয়ে গেছিল।

প্রবেশ করলাম তুষার-অঞ্চলের গহনগভীরে। পথের অন্তরায় হচ্ছে বিশাল বিরাট পাথর। কিন্তু যেন অতিমানবিক শক্তি ফেটে পড়ছিল আমাদের শরীরের প্রতিটি অণুপরমাণুতে। দুর্লঙ্ঘ সেইসব প্রস্তর-বাধা

অতিক্রম করে গেছি। মাঝেমাঝে ছেলের কথা মনে পড়েছে, আমার একমাত্র পুত্র অ্যানড্রিয়াস, নীল ঘোড়ার সওয়ার হয়ে এই মুহূর্তে সে হয়ত তদারকি-টহলে ব্যস্ত বাজার-অঞ্চলে।

এইভাবেই উঠে এলাম আরও একটা মাইল, কোলাহল আর আর্তনাদ এখানে ক্ষীণতর, গুহাটা দেখলাম তারপরেই।

হাওয়ার জোর এখানে এত বেশি যে, খড়কুটো পর্যন্ত ভেঙে দেয়। কৃপাণ-সমান এই হাওয়ার সামনে দাঁড়িয়ে থাকাও বিপজ্জনক। উড়িয়ে নিয়ে যাবে যে-কোনও মুহূর্তে।

তাই গুহা কন্দরেই আশ্রয় নেওয়া সঙ্গত মনে করলাম।

গুহার মুখ তখনও অনেক উঁচুতে। ভীষণ এই বায়ুবেগের তোয়াক্কা না করে, আশপাশের প্রলয়ঙ্কর অন্তরায়দের তুচ্ছজ্ঞান করে, আমরা অসম্ভবকে সম্ভব করলাম। গুহামুখে পৌঁছে গেলাম।

কিন্তু গুহার মধ্যে ঢুকব কি করে ? প্রবেশ পথ তো নেই।

বিপজ্জনক প্রস্তরসমাকীর্ণ পর্বত্রগাত্রে পথের সন্ধানে পাগল হয়ে ঘুরতে লাগলাম। গোঁ-গোঁ করে গর্জন ছেড়ে যেন হাজারো খড়্গ চালিয়ে ভীম-বায়ু আমাদের কচুকাটা করে আমাদের উড়িয়ে নিয়ে যেতে চাইল, গুহার মুখ দেখতে পাচ্ছি—অথচ সেই মুখে পৌঁছোনোর পথ খুঁজে পাচ্ছিনা। দূর থেকেই দেখতে পাচ্ছি, তুষার ঝুরি-আবৃত করে রেখেছে গুহামুখ—অদ্ভুতদর্শন বিচিত্র কি যেন রয়েছে প্রবেশর মুখে আশেপাশে।

শুধু শরীর আর মনের শক্তি ছাড়াও, কৌতূহল চরিতার্থ করার অদম্য শক্তি আশ্চর্যভাবে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়ে পৌঁছেছিল গুহা মুখে।

ছায়াচ্ছন্ন পাথর ধরে ধরে প্রবেশ করলাম ভেতরে। পেল্লায় সেই পর্বত কন্দরের কিছুটা ভেতরে ঢুকেই দ্বন্দ্বে পড়লাম। আর ঢোকা উচিত হবে কী? ভেতরে নিকষ তমিস্রা—কে বা কি আছে, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। যে বস্তুগুলো আঁকড়ে দাড়িয়ে আছি, সে জিনিসগুলো যেন কেমনতর—পাথর যতই আতীক্ষ্ণ হোক—এই রকম কি হয়? পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়েছি ভয়ে—পিঠে যে খোঁচা লাগছে, সেকি পাথরের খোঁচা? এ কিরকম গুহা? দামাল প্রকৃতির তাড়াখেয়ে এ কোথায় এসে ঢুকলাম?

আঁধারে চোখ সয়ে গেল একটু একটু করে। দেখলাম, মাছের হাড় চিকমিক করছে আশেপাশে।

ভেতের আসতে বললাম মেয়েদের। পায়ের তলার পাথর যখন শক্ত—তখন বাইরে দাঁড়িয়ে ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করার দরকার নেই।

আর তারপরেই বুঝলাম, দাঁড়িয়ে আছি একটা প্রকাণ্ড তিমি শরীরের মধ্যে। বিশাল তিমি তার শরীর দিয়ে তৈরি করেছে অতিকায় এই গুহা।

আশেপাশে কিম্ভূত যে বস্তুগুলো এতক্ষণ আতঙ্কর সঞ্চার ঘটিয়ে চলছিল আমার মনের মধ্যে—সেগুলো সবই লাইনবন্দী তিমির হাড়। আস্ত একটা তিমি-কঙ্কাল। বিশাল হৃৎপিণ্ড একটা ছিল যেখানে—আমার হাত পৌঁছে যাচ্ছে সেখানেও।

সুদূর অতীতে কোনও এক সময়ে সমুদ্র উঠে এসেছিল পাহাড়ের এই উচ্চতায়—মরা তিমি আটকে গেছিল বিশাল বিকট পাথরের খাঁজে—শামুকের খোলা আর ছোট ছোট নুড়ি-পাথর ছড়িয়ে আছে চারপাশে।

নতজানু হয়ে বসে পড়েছিলাম। ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা নিবেদন করেছিলাম। বিমুগ্ধ চিত্তে তাঁর লীলা-কীর্তন করেছিলাম। না জানি, অতীতে কতবার তিনি এইভাবে মহাপ্রলয় জাগ্রত করে, জলধিকে শূন্যে তুলে, ডলফিন আর তিমিদের আছড়ে ফেলেছেন সুউচ্চ পর্বতের শিখরে-শিখরে। মানুষ পরে হতভম্ব হয়েছে সাগরতলের প্রাণী কঙ্কালদের শিখর অঞ্চলে দেখে। বিস্ময়ে মূক হয়ে থেকেছে। কল্পনাতেও আনতে পারেনি রুদ্ররূপী প্রকৃতির তাণ্ডব নৃত্যের মহিমা।

তিমি-গুহায় ঢুকে উপলব্ধি করেছিলাম, অভিযানের শেষে পৌঁছেছি—আর ওপরে ওঠা যাবে না—যাওয়ার দরকারও নেই। মরতেই যদি হয়, ঈশ্বরের ইচ্ছে যদি তাই থাকে—তবে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করব এই তিমি-গুহায়। পৃথিবী তো আর আমাদের জন্যে নয়। সেখানে এখন থইথই করছে জলধি—নৃত্য করছে অনল। যে দিকে দু'চোখ যায়, সব কিছু জলের তলায়। দেখছি শুধু আগুন আর জল। গোটা ইউরোপ জলের তলায়—সেই সঙ্গে এশিয়া মাইনর। ডুবে গেছে ইণ্ডিয়া—হিমালয় বাদে। ব্যাবিলন এখন সাগর তলে।

ঘুমোলাম গুহার মধ্যে—সারারাত। ভোরে ঘুম ভাঙল গুহামুখের আবছা আলোয়। পাছে মেয়েদের ঘুম ভেঙে যায়, তাই পা টিপে টিপে এলাম গুহামুখে।

যা দেখলাম, স্বচক্ষে দেখেও তা বিশ্বাস করতে পারলাম না।

নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে ক্যালিনড্রা শহর। স্তম্ভসারি নেই, বন্দর নেই, মাছ ধরা নৌকো নেই, বাজার-চত্বর নেই, উপকূলে কেউ নেই।

আকাশ সুনীল। তপনদেব কিরণ বিকিরণ করে চলেছেন পরমানন্দে। আমি দাঁড়িয়ে আছি তুষারাচ্ছন্ন পাহাড়ি ঢালে। একটু নিচেই থমথমে নৈশব্দ বুকে নিয়ে বিরাজ করছে দিগন্তব্যাপী গভীর নীল সমুদ্র। অনেক দূরে প্রশান্ত জলধির ওপর উড়ছে আর কোঁকর-কোঁ করছে কয়েকটা বনমোরগ।

পাখির পালক দিয়ে পোশাক বানিয়েছিল আমার মেয়েরা, শীত নিবারণের জন্যে। রচনা করেছিল শয্যা—আরামে ঘুমোনোর জন্যে। গুহামুখে পালক দিয়ে ছোট্ট বেদী নির্মাণ করেছিল—উপাসনা করার জন্যে।

[ক্রমশঃ]

নবম পরিচ্ছেদ

পায়ের কাছে ভেসে এসেছে মরা মাছ—সেই মাছ খেয়েছি। তারপর জালে মাছ ধরেছি, পাখি ধরেছি—ক্ষুধা নিবৃত্তি করেছি। পাখির মগজ পুড়িয়ে তা থেকে কালি বানিয়েছি—কাগজ আর কলম সঙ্গেই ছিল। গুহামুখে বসে উদাস বিষন্ন চোখে তা দেখেছি, সেই সবেরই ছবি এঁকে রেখেছি। মড়া ভেসে আসত প্রথম-প্রথম ; তারপর আর এল না। ডুবে গেল জলের তলায়। ভেসে আসত খাট, আলমারি, আরও কত কি—যা ভেসে থাকে জলে। এসেছে ভাঙা চোরা নৌকো। আমি শুধু ছবি এঁকেই গেছি। জানিতো এইখানেই একদিন মরব—আমার কঙ্কাল ঠাঁই পাবে তিমির কঙ্কালের কফিনে।

মাথার ওপরে অনেক উঁচুতে নগাধিরাজ যেন অতন্দ্র নয়নে আর পরমকৌতুকে নিরীক্ষণ করে গেছে আমার বিফল প্রয়াস। কে দেখবে এই সব ছবি ? কার জন্যে আঁকছি ? তুষার কিরীট পরে আকাশ ছোঁওয়া শ্বেতশুভ্র পর্বতচূড়া শুধু অবলোকনই করে গেছে। ধু-ধু পৃথিবীতে বুঝি শুধু আমাদের তিনটে হৃৎপিণ্ডই ধুকপুক করে গেছে?—কান পেতে শুনছে অদ্রি-অধীশ্বর ওই শ্বেতপর্বত। অদ্রি-ঈশ বলেই তো প্রলয় তাকে সংহার করতে পারেনি।

আমার মেয়েদুটো কিন্তু হেসে আর নেচে, গান গেয়ে আর খেলায় মেতে আমাকে একেবারে মিইয়ে পড়তে দেয়নি একদিনের জন্যেও। ওরাই একদিন চেপে ধরল আমাকে—"চিঠি লেখো দিওদার-কে।"

লিখলাম। যা দেখেছি, তার ছোট্ট বর্ণনা দিলাম, তাঁকে আমন্ত্রণ জানালাম। পায়রার পায়ে বেঁধে তাকে উড়িয়ে দিলাম। সে সোজা চলে গেল পূব দিকে—যে দিক থেকে সূর্য ওঠে—সেই দিকে।

চিঠি পাঠানোর পরের দিন থেকেই কিন্তু ভেবেছি, কি দরকার ছিল চিঠি পাঠানোর। দিওদার বেঁচে আছেন—এ আশা যখন করিনা, তখন উনি আমাদের উদ্ধার করতে আসবেন—সেই আশাই বা রাখছি কেন মনের মধ্যে।

তারপর অবশ্য ভেবেছি, পৃথিবী যদি ফের নতুনভাবে গড়ে ওঠে, এই মহা-আতঙ্কর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ রেখে যাওয়ার দরকার আছে বৈকি। নোয়া বেঁচে গেছিলেন তাঁর নৌকোয়। আর আমাদের নৌকো একটা বিশাল রাজকীয় পর্বত, আমাদের নিবাস একটা তিমি-কঙ্কালের পাঁজরার ফোঁপরা গহ্বরে।

নীল জলে মাছ ধরতাম আর এই সব কথা ভাবতাম। রাতে শুয়ে শুনতাম, ঠক-ঠকাস করে মরা মানুষের করোটি ঠোক্কার খাচ্ছে পাহাড়ের গায়ে। কত মানুষ না জানি মরেছে—সব ডোবেনি—এখনও ভেসে আসছে। ঘুমিয়ে পড়ে কত দুঃস্বপ্নই না দেখেছি। ঘুম ভাঙলেই রোজ সকালে সমুদ্রের পাড়ে দাঁড়িয়ে দূর দিগন্তের দিকে চেয়ে থেকেছি, জলের গভীরে তাকিয়ে হারানো ক্যালিনড্রা শহরকে দেখবার চেষ্টা করেছি, কান পেতে অনেক কণ্ঠস্বর যেন শুনতে পেয়েছি। তারপর ভেবেছি, নিশ্চয় মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে আমার।

তখন মস্তিষ্ক সুস্থ রাখার প্রয়াসে শামুক কুড়িয়ে গেছি এন্তার। এত উঁচুতে পাহাড়ের গায়ে বড় বড় মাছের হাড় দেখে অবাক হয়েছি। দেখেছি ঝিনুক আর প্রবাল। যে সব জিনিস সমুদ্রের তলায় থাকা উচিত, সেই সব জিনিসই রয়েছে মেঘলোকচুম্বী এই পাহাড়ের গায়ে—এত উঁচুতে। কেন ? এরকম শ'খানেক প্রশ্ন কুরে কুরে খেয়েছে আমাকে—তিমি-কঙ্কালের আলোয় দিনের পর দিন কেটে গেছে এইসব প্রশ্নের সমাধান চিন্তায়।

এসে গেল শীত। মসৃণ সমুদ্র-পৃষ্ঠে ছোট ছোট নুড়ির মতন বরফ খণ্ড ভেসে এল। আমি কিন্তু প্রতিদিন আকাশের দিকে চেয়ে বসে রইলাম সবুজ পায়রার ফিরে আসার প্রতীক্ষায়।

এই সময়ে আমার মেয়েরা ওদের ষষ্ঠ-ইন্দ্রিয় দিয়ে যেন বুঝতে পারল, আমার হারানো ছেলে ফিরে আসছে।

আমার তা বিশ্বাস হয়নি।

বরফ আরও জমছে সমুদ্রে। মেয়েরা উন্মাদিনীর

মতন চেয়ে থেকেছে সমুদ্রের দিকে সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত। খুব ভাবনা হয়েছিল আমার—পাগল হয়ে যাচ্ছে কি ভাইয়ের শোকে।

তারপর একদিন দূর সমুদ্র থেকে ঢেউ-এর মাথায় নাচতে নাচতে ভেসে এল আমার পুত্র।

বরফেমোড়া অবস্থায়। গোটা শরীর ঘিরে বরফ জমে শক্ত হয়ে রয়েছে। রোদ্দুর ঝলসে যাচ্ছে বরফের গা থেকে। পাশ ফিরে ঘুমোচ্ছে, হাত ভাঁজ করে মাথার বালিশ করে নিয়েছে।

সমুদ্র মড়া ফিরিয়ে দেয়, শুনে এসেছি এতদিন। তাই ফিরিয়ে দিচ্ছে আমার মরা ছেলেকে।

হাঁটুজলে নেমে গিয়ে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে গেছিলাম। মেয়েরা নেমে এসেছে আমার পাশে। তুষার ঝরছে মাথায়।

আরও কাছে ভেসে এল বরফ-আধার। অ্যানড্রিয়াসকে এখন আরও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। পরনে রয়েছে নীল পোশাক—জামায় ঝিনুকের বোতাম। রোদ্দুরে ঝলসে মুখ ব্রোঞ্জ-বর্ণ ধারণ করেছে।

টেনে তুললাম জল থেকে, বরফ গলে গেল আস্তে আস্তে চোখ খুলল আমার ছেলে। ফের চোখ বুঁজল। হাসছে আগাগোড়া—যেন কত গুপ্ত ব্যাপার হাসি দিয়ে চাপা দিচ্ছে।

বেঁচে রয়েছে। শ্বাসপ্রশ্বাস বইছে। নাকের কাছে আর ঠোঁটের সামনে পাখির পালক ধরে সে পরীক্ষা করে নিয়েছি।

ধরাধরি করে নিয়ে এলাম গুহার ভেতরে। কথা বলল না। ঘুমিয়ে পড়ল। গভীর ঘুম। দেখে ভাল লাগছিল, ভয়ও হচ্ছিল—যদি এ ঘুম আর না ভাঙে ? ঘুম যে মরণের ভাবমূর্তি !

দিনের পর দিন সেবা করে গেলাম অ্যানড্রিয়াসের। খাইয়ে দিলাম। গায়ে সেঁক দিয়ে গা গরম রাখলাম। রোদ্দুরে নিয়ে গিয়ে বালিশে মাথা রেখে শুইয়ে দিলাম। ঘুম কিন্তু ভাঙলা না।

ভাঙল একদিন। চোখ মেলল। বোনেদের দেখল। হাসল। বললে—"আমার নীল ঘোড়া কই ?"

সূর্য তখন মাথার ওপর। তুষার ঝরা বন্ধ হয়েছে. মাটিতে জমে থাকা তুষার রোদ্দুরে নীল আর আগুনে-লাল দ্যুতি বিকিরণ করছে।

বললাম—"কোত্থেকে এলি ?"

হাসল অ্যানড্রিয়াস, জবাব দিল না। সমুদ্রের দিকে চেয়ে মাথা নাড়ল খুব আস্তে।

বললে—"আর সবাই কোথায় ?"

আগুন আর প্লাবনের ঘটনা বললাম। আমরা তিন জনই শুধু টিঁকে গেছি—রয়েছি গুহায়।

একটু একটু করে নিজের কথা বলে গেল অ্যানড্রিয়াস।

বাজার-চত্বরে আগুন ফেটে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণের প্রচণ্ড ধাক্কায় ও ছিটকে গেছিল শূন্যে—আছড়ে পড়েছিল সমুদ্রের জলে—তলিয়ে গেছিল একদম তলদেশে—যখন সমুদ্র নিজেই দু'ভাগ হয়ে দু'পাশে সরে গেছে—ঠিক তখন। আলোড়িত বাতাস নিশ্চয় ওকে মুড়ে নিয়ে ডুব দিয়েছিল জলের তলায়—তাই সমুদ্রের তলায় গিয়েও নিঃশ্বাস নিতে এতটুকু কষ্ট হয়নি। খুবই ঠাণ্ডা সে জায়গাটা। ওর নিজের নিঃশ্বাসই জমে বরফ হয়ে গেছিল। একা নয়—আরও অনেকে ছিল ওর সঙ্গে—তাদেরও সবাই নিশ্চয় মরে যায়নি।

শুনে স্বস্তি পেলাম। তাহলে আরও জীবিত মানুষের

দেখা পাওয়া যাবে। একে একে ভেসে উঠবে সমুদ্র-পৃষ্ঠে।

পালকের পোশাক পরিয়ে দিলাম ছেলেকে। কনকনে এই ঠাণ্ডায় গা গরম করা দরকার। উপকার হলো। উঠে বসল। তিন ছেলে মেয়ে আগের মতন নাচগান হুল্লোড় শুরু করে দিল।

দিন কয়েক পরে ভেসে এসে তীরে ঠেকল ফাদারের রত্নখচিত পবিত্র ক্রুশ।

এবার যেন ফিরে আসেন ফাদার স্বয়ং—প্রাণস্পন্দিত অবয়ব নিয়ে।

সেই প্রত্যাশায় প্রর্থনায় বসলাম চারজনে—নতজানু হয়ে সমুদ্রের কিনারায়। চারদিক ভারি শান্ত—নৈশব্দকে নিটোল থাকতে দিচ্ছে না শুধু গাংচিলদের কর্কশ গলাবাজি—বাতাসে ঝুরঝুর করে ঝরছে না তুষার—যেদিকে দু'চোখ যায়—শুধু গভীর নীল সমুদ্র। আচমকা মনে হলো, আকাশ যেন আরও ঘন নীল হয়ে গেল। চারপাশের তুষারস্তূপও যেন আচম্বিতে আরও ঘন নীলবর্ণ ধারণ করল। জলের মাছগুলোও যেন আরও ঝলমলে রঙিন হয়ে উঠল। আমাদের অঙ্গাবরণের নানা রঙের পালক থেকে যেন সহসা সুন্দরতর বর্ণদ্যুতি বিচ্ছুরিত হতে লাগল। মাথার ওপর জ্বলছে সূর্য।

অনেক নিচে পায়ের তলায় ভৈরব রবে পাতাল প্রদেশ যেন চিরে—দু'ফাঁক হয়ে যাচ্ছে।

শুরু হয়েছে হিমানী সম্প্রপাত—বরফের বিশাল চাঁই গড়িয়ে নেমে যাচ্ছে পাহাড়ের গা বেয়ে।

এরকম ঘটনা কখনও ঘটেনি। এরকম দৃশ্য কখনও দেখা যায়নি। মানুষ দাঁড়িয়ে আছে উঁচু পাহাড়ি অঞ্চলে, চারপাশ দিয়ে হু-হু করে নেমে যাচ্ছে তুষার... হিমবাহ নামছে ভীমবেগে...প্রচণ্ড আকর্ষণে টেনে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছে মানুষকে হু-হু করে নিচের দিকে...

পৃথিবীর নবজন্ম এভাবে কোনও মানুষ কখনও দেখেনি।

হু-হু করে সমুদ্র নেমে যাচ্ছে বলেই আরম্ভ হয়ে গেছে হিমানী সম্প্রপাত। সমুদ্র নেমে যাওয়ার সময়ে পাহাড়ের সানুদেশ থেকে তুষার আর বরফকে শুষে নিয়ে চলে যাচ্ছে নিচে...নিচে...আরও নিচে। পায়ের নিচে মাটি তলিয়ে যাওয়ার মতন ব্যাপার। জমাট বরফের ভিত আর নেই—উল্কা বেগে বিশাল হিমবাহ তাই পাহাড়ের ওপর দিয়ে হড়কে নেমে যাচ্ছে নিচে !

নামছে এত দ্রুত যে আমাদের শূন্যে ছিটকে দিতে চাইছে। কোনও মতে আমরা আঁকড়ে রয়েছি পায়ের তলার বরফ ঢাকা পাথর। চোখের কোণ দিয়ে দেখলাম, যে তিমি-গুহার সমানে কিছুক্ষণ আগেও আমি দাঁড়িয়েছিলাম, সেই তিমি-গুহা ছায়াচ্ছন্ন নীল চক্ষুর মতন জেগে রয়েছে বহু উঁচুতে পাহাড়ের গায়ে।

কিন্তু নামছে কোথায় সমুদ্র ? যাচ্ছে কোথায় সমুদ্রের জল ?

নিশ্চয় পাতাল রন্ধ্রে—যেখানে আছে অজস্র গুহা আর গহ্বর—যাদের অস্তিত্বের কোনও খবর রাখেনা ভূ-পৃষ্ঠের মানুষ....

অথবা, হয়তো বিপুল জলধি এই মুহূর্তে সগর্জনে আছড়ে পড়ছে আফ্রিকার মরুভূমির ওপর...

যাই ঘটুক না কেন, শুভ্র প্রভাতে শুভ্রতর হিমবাহর পিঠে চেপে মর্ত্যে অবতরণের মতন আনন্দদায়ক আর কিছুই নেই। নক্ষত্রবেগে নেমে যাচ্ছি আর দেখছি সমান বেগে জলের নিচের ক্যালিনড্রা শহর উঠে আসছে আমাদের দিকে। দেখছিলাম আর ওই অবস্থাতেই ভাবছিলাম, সমুদ্রের জল ক্যালিনড্রা শহরের মাথায় এসে থেমে যাবে, না, গোটা ভূমধ্যসাগরকে শুকনো খটখটে জমি বানিয়ে ছাড়বে ?

খুলে গেছে সমুদ্রে তোরণ। তলদেশে হয়তো দেখতে পাব ডুবে যাওয়া জাহাজ, রত্নবোঝাই পেটিকা, আর গ্রীক প্রস্তরমূর্তি। একদা যেখানে শুধু তিমি-রা বিচরণ করেছে, আমরা হেঁটে বেড়াবো সেই স্থলভূমিতে।

বিপুল উত্তেজনায় গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে যাচ্ছিলাম চারজনেই। ক্যালিনড্রার অতি-পরিচিত চেহারা এবার দেখা যাচ্ছে। হু-হু করে নেমে যাওয়া জল-তরঙ্গের নিচে দেখতে পাচ্ছি বন্দর আর বাজার-চত্বর, বড় বড় থামের সারি আর নীল মার্বেল—সাদা পাথরের প্রাসাদ। জলমগ্ন বাড়ি আর থামের আশপাশ দিয়ে সাঁতার দিচ্ছে রকমারি মাছের দঙ্গল। ক্যালিনড্রাতে গিয়ে এই পতন আটকে যাবে বলে তো মনে হচ্ছে না—নামব আরও নিচে। সবইতো নেমে যাচ্ছে...যাচ্ছে তো যাচ্ছেই...তুষার নামছে...হিমবাহ নামছে....সমুদ্র নামছে। বাজার-চত্বরে অনেকগুলো সোনার বর্ম দেখলাম—এল কোত্থেকে বুঝতে পারলাম না। কানে ভেসে আসছে সাগরের গান—আগেও এ গান শুনেছি—কিন্তু সেইদিন সেই মুহূর্তে বজ্রনাদে সেই সঙ্গীত যেন কানের পর্দা ফাটিয়ে দিতে চাইছিল—প্রলয়রোলের বিপরীত সেই সঙ্গীত যে কি সুরে রচিত—তা আমার অজানা। সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম অতিকষ্টে—তা সত্ত্বেও আচমকা ছিটকে গেলাম শূন্যে—সুরভিত মদির বাতাসের মধ্যে।

[ক্রমশঃ]

লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির সায়েন্স ফ্যান্টাসি

ম হা প্লা ব ন

সম্পাদনা ঃ অদ্রীশ বর্ধন

দশম পরিচ্ছেদ

বাতাসের বুক চিরে যখন নিম্নে অবতীর্ণ হচ্ছি, তখন গলা ছেড়ে গান গেয়ে উঠল ছেলে আর মেয়েরা। ফুর্তিতে ফেটে পড়ছি তা সকলেই।

ওই অবস্থাতেই পতনের বেগের হিসেব রেখে যাচ্ছিলাম। পড়ছি আগের চেয়ে আস্তে। সমুদ্র যেন থতিয়ে যাচ্ছে আগের চেয়ে আস্তে। খুঁজে পেয়েছে নিজের উচ্চতা। ক্যালিনড্রা শহর থেকে এখন তেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে জল—স্তম্ভগুলোর পাশ দিয়ে—খুলে দেওয়া হয়েছে যেন জলাধারের দরজা। ফোয়ারার তলদেশের মতন চকচক করছে গোটা শহর। একটু দূরে রোদ ঝলসে যাচ্ছে সমুদ্রের জলে। সামুদ্রিক পাখিরা কিন্তু এখনও উড়ছে অনেক ওপরে—ঘাবড়ে গেছে নিশ্চয়—চেঁচিয়ে যাচ্ছে গলা ফাটিয়ে, আর খুঁজে মরছে সমুদ্রের বুকে নিজেদের প্রতিবিম্ব—উড়ন্ত অবস্থায় সেই প্রতিবিম্ব দেখার আনন্দ তো কম নয়।

সমুদ্র নিজস্ব সমতায় পৌঁছে গেলেও হিমবাহ নেমে যাচ্ছে এখনও। সোজা গিয়ে পড়ল ক্যালিনড্রা শহরের ওপর—চাপা দিল শহরকে।

পুরো একদিন গেল বরফ গলতে। নীলজল হু-হু করে বেরিয়ে গেল সমুদ্রে। তারপরেই দেখা গেল অলৌকিক দৃশ্য। চক্ষু সার্থক করার মতন অলৌকিক দৃশ্য !

থাম আর প্রাসাদের আনাচে-কানাচে টহল দিয়ে গেল সিংহ আর চিতা—তুষার জমে রয়েছে কেশরে। আচ্ছন্নের মতন মানুষ হাঁটতে লাগল পথে-ঘাটে—রাস্তাঘাট যেখানে আস্ত আছে, সেইসব জায়গা দিয়ে। সবই কিন্তু আগের চাইতে অনেক চকচকে আর ঝকঝকে—তুষার স্নান সেরে উঠে সব কিছুই এখন অনেক চিক্কণ, অনেক অমলিন। বাদামি গিরগিটিগুলোও পাথরে গা এলিয়ে দিয়ে রোদ পোহাচ্ছে।

ভেবেছিলাম, দেখব কাঠকয়লার মতন পোড়া শহর। কিন্তু দেখলাম ঠিক তার বিপরীত। তুষার জমে রইল শহরের নানা জায়গায়—যেমন জমে থাকে পাহাড়ের আনাচে-কানাচে খাঁজে—গলতে শুরু করল মিশরের দিক থেকে উষ্ণ বাতাস বয়ে আসবার পর। আর্মেনিয়ানরা রোদ আটকানোর জন্যে চোখে হাতচাপা দিয়ে বলে গেল বিমূঢ় কণ্ঠে—"হয়েছিল কী ? ঘুমোচ্ছিলাম নাকি ? আগুন আর প্লাবন কি আদৌ এসেছিল ?" বাজার-চত্বরের দিকে অবাক চোখে চেয়ে বলেছিল—"স্ট্যাচুগুলো উল্টে ঠিকরে গেল কেন ? রাস্তাঘাট ফেটে চৌচির কেন ? আগুনে পোড়ার কালো দাগ দেখা যাচ্ছে কেন ?" নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছিল অকাতরে সৃষ্টি রসাতলে যাওয়ার সময়ে—এইরকম বিশ্বাস দানা বেঁধেছিল প্রত্যেকেরই মনের ভেতরে।

আর আমি ভাবছিলাম, এরা বেঁচে গেল কি করে ?

হয়তো, প্রাবন আর প্রভঞ্জন এমনই আচমকা এসে গেছিল যে, এত মানুষ নিমেষে চালান হয়ে গেছিল নানান জায়গায় বায়ুর পিঞ্জরে বন্দী অবস্থায়—আছড়ে পড়ে জ্ঞান হারিয়েছিল বলেই বিশ্রাম নিয়ে গেছে এতগুলো দিন, হয় নিজেদের বাড়ির মধ্যে—অথবা ঝড় তুলে নিয়ে গিয়ে যেখানে ফেলেছে—সেইখানে। ঘুমিয়েছে নিরাপদে—মাথার ওপর জলধির জলে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়নি।

আবার, কিছু মানুষ এমন জায়গায় ঘুম কাটিয়ে উঠে বসেছে—যেখানে কোনও মানুষ ঘুমোতে যায় না ; যেমন, গির্জের চুড়োয় একজন আর্মেনিয়ান মেয়ে ; উল্টে যাওয়া মাছধরা নৌকোর ওপর আর একটি মেয়ে। পাথরে বন্দী এক বুড়ো গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে বাইরে লোক জড়ো করে ফেলেছিল—গাঁইতি, শাবল চালিয়ে পাথর ভেঙে তাকে বাইরে আনতে হয়েছে। পাথরের এই চারদিক বন্ধ কারাগার তৈরি হলো কি করে বুড়োকে ঘিরে—সেটা একটা রহস্য। আমার তো মনে হয়, নিদারুণ উত্তাপে পাথর গলে গিয়ে প্রবেশ-পথ বন্ধ করে দিয়েছিল। প্রকৃতি নিজের হাতে কফিন বানিয়ে তাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে ফের ঘুম ভাঙিয়ে বের করে এনেছে সূর্যের আলোয়। কিন্তু তার ঘোর কাটতে লেগেছে অনেক

সময়। পাথরের পিঞ্জরে বন্দী ছিল এতগুলো দিন বহাল তবিয়তে—এই পরম সত্য মানতে রাজী নয় সে কিছুতেই। বলেছিল বারবার—"আমি কি ডিমের মধ্যে আটকে ছিলাম ? ডিম ভেঙে বেরিয়ে এসেছি ? কী আশ্চর্য ! কী আশ্চর্য !

বেশ কয়েক হপ্তা গেছে এই বৃদ্ধের স্বাভাবিক মনের অবস্থা ফিরে আসতে। অন্যান্যদের ক্ষেত্রে হয়েছে কিন্তু ঠিক তার উল্টো। ঝটিতি স্বাভাবিকের চাইতেও বেশি লাভ করেছে—অতি শান্ত হয়ে গেছে—চিত্তচাঞ্চল্য একেবারেই তিরোহিত হয়েছে। ঝড়, আগুন, জল তাদের যেন শোধন করে দিয়ে গেছে। সমুদ্র যেমন প্রশান্ত, এই মানুষগুলোর সেই প্রশান্তির সমতুল্য। দিব্বি ঘুরে-ফিরে তারা দেখছিল, কি কি আছে আর কি কি গেছে। যে-যার নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলে গেছে আর একজনকে। মেরামত করে নিয়েছে ভাঙা নৌকো—মাছ ধরবে বলে। যেভাবেই হোক, অবাক কেউ হয়নি—কারণ সবই তো রয়েছে প্রাচুর্যের মধ্যে। ফুল আগের চাইতেও ঝকঝকে, ফল আগের চাইতেও রসালো, মাটি আগের চাইতেও উর্বর। আগুন শোধন করে দিয়ে গেছে মাটিকে—পুড়িয়ে উড়িয়ে দিয়েছে ময়লা। প্রসন্ন হওয়ার মতন জিনিস রয়েছে আরও অনেক। প্রতিটি বাড়ির ছাদে সমুদ্রের নুন জমে যাওয়ায় ঝিকমিক করছে প্রতিটি ছাদ। বাঘ আর চিতারা সর্বক্ষণ টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে শহরময়—যেন ভয়ানক এই বিপর্যয় থেকে রক্ষে পাওয়ায় পুলকিত তারাও।

কতজনকে বলতে শুনেছি—"চোখে ছানি পড়েছিল নাকি অ্যাদ্দিন ? এত সুন্দর তুমি !"

প্রাণশক্তিতে ফেটে পড়ছে যেন প্রতিটি মানুষ—হাঁটাচলায় এসে গেছে শার্দুলের মসৃণ ক্ষিপ্রতা।

কিছুই পালটায়নি—বরং ভাল হয়েছে। ঝড়, আগুন, জল আর ভূকম্পের চিহ্নস্বরূপ রয়ে গেছে খান-কয়েক ভাঙাস্তম্ভ, পাথরের মূর্তি, বাড়ি আর বাজার-চত্বরের ফুটিফাটা অবস্থা।

বন্যার জল সরে যাওয়ার পর সবুজের সমারোহ বেড়ে গেছে। ঝর্ণার জল আরও মিষ্টি গান গাইছে। আকাশের বাতায়ন উজ্জ্বলতর হয়েছে। নির্মল গগন যেন একটা চোখ। ফুলের ডগাগুলো যেন মরকতমণি। সিংহেরা হেঁটে গেছে বেগুনি কেশর দুলিয়ে—পানীয়-লোহিত থাবা উঁচিয়ে।

সারাদিন আর সারারাত রাস্তায় চলেছে কোলাহল আর গানবাজানা। মিছিলের পর মিছিল। একদিন সন্ধ্যায় কিন্তু গানের গমক যেন মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। দরাজ গলার কোরাস গান যেন বেশি করে আসছে সমুদ্রতীর থেকে। দৌড়ে গেলাম বন্দরে। লোক পিলপিল করছে সেখানে। দূরে দেখা যাচ্ছে বেগুনি পাল তুলে আর লাল পতাকা উড়িয়ে দিওদার-এর কালো কাঠের জাহাজ।

ডেকের সিংহাসনে বসে আছেন দিওদার। মাথায় স্বর্ণমুকুট। হাতে চক্র আর রাজদণ্ড। আমরা ঘিরে ধরেছি তাঁকে।

প্রথম প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলাম আমি—"গোটা পৃথিবী কি ধ্বংস হয়ে গেছিল ?"

উনি বললেন—"হ্যাঁ।"

"গোটা পৃথিবী কি নবজন্ম নিয়েছে ?"

"হ্যাঁ।"

"পাপের প্রায়শ্চিত্ত হলো কি এইভাবে ?"

"হ্যাঁ। সাবধান করেছিলাম তোমাকে আগেই—অনেকবার। গ্রাহ্য করোনি। ফুর্তি নিয়ে মেতেছিলে। তাই ভয়ঙ্কর, ওই ভবিষ্যৎবক্তাকে পাঠানোর প্রয়োজন

হয়েছিল—তোমার চৈতন্য জাগাতে সে এসেছিল।"

"সে কে ?"

একটানে মুখ থেকে সাদা উলের দাড়ি খসিয়ে, মাথার মুকুট খুলে, মুখের কালো রঙ মুছে ফেললেন দিওদার।

বললেন—"চিনতে পারছ ?"

স্তম্ভিত হয়ে গেলাম—"কাউন্ট লোরেনজো ?"

হ্যাঁ, আমি কাউন্ট লোরেনজো। ডাইনিবিদ্যের সাধক—কাউন্ট লোরেনজো। ফাদার তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছিলেন এই বিদ্যেকে—নেচেছিলেন অপরসায়নবিদ্যে নিয়ে—তাই তাঁকে একটু শিক্ষা দেওয়ার দরকার ছিল। ডাইনিবিদ্যে বলে যে জ্ঞানকে তোমরা পরিহাস করেছ—সে বিদ্যের উপযুক্ত নাম আজও পাওয়া যায়নি বলেই ডাইনিবিদ্যে বলে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। যন্ত্রবিদ্যার কথা ছুঁয়ে গেছিলেন ফাদার—সব শুনেছি আমি। যন্ত্র বিদ্যা দিয়েই এই জ্ঞান আহরণ করতে হয়—সৃষ্টির মূলে যে সূক্ষ্ম শক্তি, সেই শক্তির কম্পন খুঁচিয়ে প্রলয়ঙ্কর করে তোলা যায়—তার জন্যে ডাইনিদের দরকার হয় না। অনেক সাধনা, অনেক গবেষণা করে আমি যে-সব আবিষ্কার করেছি—সে নেওয়ার উপযুক্ত এখনও হয়নি এই পৃথিবীর মানুষ। তাই তাদের টনক নড়িয়ে দিয়ে গেলাম। প্রাণময় সব কিছুই—কায়াপরিবর্তন করে, একই প্রাণের সঞ্চার সেখানে ঘটানো আজকে তোমাদের কাছে পৈশাচিক ব্যাপার মনে হচ্ছে, দূর ভবিষ্যতে তা মনে হবে না। এক মানুষের মতন হুবহু মানুষ সৃষ্টি হবে, ইচ্ছে মত প্রাণী সৃষ্টি করা যাবে। আমি তা করতে জানি। আমাকে বাজার চত্বরে দানবরূপে দেখেছিলে। সে আমারই মাছের আঁশের মতন বর্ম কলেবর—আকাশে উড়ে যাওয়ায় ডাইনিবিদ্যে নয়—গ্যাসের শক্তি আর পাখির ডানারশক্তি দিয়ে আকাশে উড়ে আগুন বৃষ্টি করার বিদ্যে—এরকম অনেক পরা-বিদ্যের কথা পুরাণ লিখে গেছে—যেসব বিদ্যের আদ্যপান্ত জানা ছিল সেকালের কিছু সাধকের—কিন্তু তাঁরা তার প্রচার করেননি বলেই তা এখন গুপ্তবিদ্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু আমার কাছে তা গুপ্ত নয়। তা দেখিয়ে গেলাম। বাজার-চত্বরে সোনার বর্ম ফেলে গেছে আমারই লোক—দেখে গেছে তোমাদের অবস্থা। ফাটিয়ে টুকরো টুকরো করে দেওয়াও আমার কাছে এমন কিছু নয়। এক্সপেরিমেন্ট সফল হয়েছে। নেমে যাও জাহাজ থেকে।"

জলদগম্ভীর সেই আদেশ অমান্য করতে পারলাম না। দলবল নিয়ে ফিরে গেলাম সৈকতভূমিতে। আর তারপরেই দেখা গেল সেই অবিশ্বাস্য দৃশ্য।

অতবড় জাহাজটাকে ঘিরে ধরল একটা স্বচ্ছ পদার্থ—ঠিক যেন একটা কাঁচের ডিমের মধ্যে রয়েছে জাহাজ।

তারপরেই প্রদীপ্ত হলো সেই স্ফটিক-ডিম। ভয়ানক গর্জনে কানে তালা লেগে গেল। জলে ছেড়ে শূন্যে উঠে পড়ল জাহাজ সমেত স্ফটিকাধার। আগুন ঠিকরে গেল তার গা থেকে।

ধীরে ধীরে উঠে গেল আকাশের দিকে—আচমকা ধূমকেতুর মতন প্রচণ্ড গতিবেগে সেই আগুনের গোলা অনেক দূরে চলে গিয়ে বিন্দুবৎ হয়ে রইল সন্ধ্যার আকাশে।

এখন তা একটা তারকা ছাড়া কিছুই নয়। অগণিত তারকাদের অন্যতম।

ভয়ে বুক কেঁপে উঠল আমার। ওই তারকা যে আবার নেমে আসবে—এই আতঙ্ক অবশ করে দিল আমার তনুমন। আমি জ্ঞান হারালাম।

চোখ মেললাম ফাদারের ঝাঁকুনিতে।

ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলাম তাঁর মুখের দিকে। দেখলাম, মোমবাতি হাতে ছেলেমেয়েরা উদ্বিগ্ন চোখে চেয়ে আছে আমার দিকে। আমি শুয়ে আছি আমার বাড়ির বারান্দায়—ফোনটিমিগলিয়োন গ্রামের বাড়ির বারান্দায়। চারিদিকে অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন আঙুর খেত। দূরে কাউন্ট লোরেনজোর দুর্গ প্রাসাদ। মাথার ওপর একতাল কালো আঁধার.....

সেই মেঘ। সকালের আলোয় যে মেঘ আগুন-রাঙা হয়ে উঠবে।

"হয়েছে কী ? ফট করে অজ্ঞান হয়ে গেলেন কেন?" জিজ্ঞেস করলেন ফাদার।

ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলাম। তারপর বলে গেলাম, জ্ঞান হারিয়ে স্বপ্নের মধ্যে আমি যে-দৃশ্য দেখেছি—সেই কাহিনী।

শুনে গুম হয়ে গেলেন প্রফেসর।

পরের দিন সকালে মেঘ আর লাল হলো না। একটু একটু করে ভেঙে গিয়ে আকাশে মিলিয়ে গেল।

খোঁজ নিলাম কাউন্ট লোরেনজোর দুর্গ-প্রাসাদে। নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন তিনি—গতকাল রাত থেকে।

(সমাপ্ত)